1842. Nb. 931. B.

বন-বাণী

182. Nb. 931. 2.

বন-বাণী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

141. 23.8.33.

NATIONAL LIBRARY
No. Imp 39975
DATE 3/09/09
CALCUTTA

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রকাশক—রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায়।

বন-বাণী

প্রথম সংস্করণ (১১০০) আশ্বিন, ১৩৩৮।

মূল্য—৪৲ চারি টাকা।

শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)।
রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

আমার ঘরের আশেপাশে যে-সব আমার বোবা বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হ'য়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছলো। (তাদের ভাষা হ'চ্চে জীব-জগতের আদিভাষা, তা'র ইসারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে; হাজার হাজার বৎসরের ভুলে-যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়; মনের মধ্যে যে-সাড়া ওঠে সেও ঐ গাছের ভাষায়,—তা'র কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তা'র মধ্যে বহু যুগযুগান্তর গুন্‌গুনিয়ে ওঠে।)

(ঐ গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হ'য়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তাহ'লে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণসমুদ্রের কূলে, যে-সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীরতলে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। "এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রাণি" দেখি ফুলে ফলে পল্লবে; তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্ম্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি।

বোষ্টমী একদিন জিজ্ঞাসা ক'রেছিলো, কবে আমাদের মিলন হবে গাছতলায়? তা'র মানে গাছের মধ্যে প্রাণের বিশুদ্ধ সুর; সেই সুরটি যদি প্রাণ পেতে নিতে পারি তাহ'লে আমাদের

মিলন-সঙ্গীতে বদ্-সুর লাগে না। বুদ্ধদেব যে-বোধিদ্রুমের তলায় মুক্তিতত্ত্ব পেয়েছিলেন, তাঁর বাণীর সঙ্গে সঙ্গে সেই বোধিদ্রুমের বাণীও শুনি যেন,—দুইএ মিশে আছে। আরণ্যক ঋষি শুন্‌তে পেয়েছিলেন গাছের বাণী,—"বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবিতিষ্ঠত্যেবঃ"। শুনেছিলেন "যদিদং কিঞ্চ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং"। তাঁরা গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন, "কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ"—প্রথম-প্রাণ তা'র বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেচে এই বিশ্বে? সেই প্রৈতি সেই বেগ থাম্‌তে চায় না, রূপের ঝর্‌না অহরহ ঝর্‌তে লাগলো, তা'র কত রেখা, কত ভঙ্গী, কত ভাষা, কত বেদনা! সেই প্রথম প্রাণ-প্রৈতির নবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টির চিরপ্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে বিশুদ্ধভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে?

এখানে ভোরে উঠে হোটেলের জান্‌লার কাছে ব'সে কত দিন মনে ক'রেচি শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে আমার সেই ঘরের দ্বারে প্রাণের আনন্দরূপ আমি দেখ্‌বো আমার সেই লতার শাখায় শাখায়; প্রথম প্রৈতির বন্ধ-বিহীন প্রকাশ-রূপ দেখ্‌বো সেই নাগকেশরের ফুলে ফলে। মুক্তির জন্যে প্রতিদিন যখন প্রাণ ব্যথিত ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে, তখন সকলের চেয়ে মনে পড়ে আমার দরজার কাছের সেই গাছগুলিকে। তা'রা ধরণীর ধ্যানমন্ত্রের ধ্বনি। প্রতিদিন অরুণোদয়ে, প্রতি নিস্তব্ধরাত্রে তারার আলোয় তাদের ওঙ্কারের সঙ্গে আমার ধ্যানের সুর মেলাতে চাই। এখানে আমি রাত্রি প্রায় তিনটের সময়—তখন একে রাতের অন্ধকার, তাতে মেঘের আবরণ—অন্তরে অন্তরে একটা অসহ্য চঞ্চলতা অনুভব করি নিজের কাছ থেকেই উদ্দামবেগে পালিয়ে যাবার জন্যে। পালাবো কোথায়? কোলাহল থেকে সঙ্গীতে। এই আমার অন্তর্গূঢ় বেদনার দিনে শান্তিনিকেতনের

চিঠি যখন পেলুম তখন মনে প'ড়ে গেল সেই সঙ্গীত তা'র সরল বিশুদ্ধ সুরে বাজ্‌চে আমার উত্তরায়ণের গাছগুলির মধ্যে,—তাদের কাছে চুপ ক'রে ব'স্‌তে পার্‌লেই সেই সুরের নির্ম্মল ঝর্‌না আমার অন্তরাত্মাকে প্রতিদিন স্নান করিয়ে দিতে পার্‌বে। এই স্নানের দ্বারা ধৌত হ'য়ে স্নিগ্ধ হ'য়ে তবেই আনন্দলোকে প্রবেশের অধিকার আমরা পাই। পরম সুন্দরের মুক্তরূপ প্রকাশের মধ্যেই পরিত্রাণ,—আনন্দময় সুগভীর বৈরাগ্যই হ'চ্চে সেই সুন্দরের চরম দান।

ভিয়েনা,
২৩শে অক্টোবর, ১৯২৬।

সূচীপত্র

বন-বাণী	...	...	...	১—৪৫
নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা		...	...	৪৬—১৩২
বর্ষামঙ্গল	...	...	...	১৩৩—১৪৪
নবীন	...	...	...	১৪৫—১৬৩

বন-বাণী

বৃক্ষবন্দনা

অন্ধ ভূমিগর্ভ হ'তে শুনেছিলে সূর্য্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ,
ঊর্দ্ধশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ-'পরে ; আনিলে বেদনা
নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে।
সেদিন অম্বর মাঝে
শ্যামে নীলে মিশ্রমন্ত্রে স্বর্গলোকে জ্যোতিষ্ক সমাজে
মর্ত্ত্যের মাহাত্ম্য-গান করিলে ঘোষণা। যে-জীবন
মরণ-তোরণদ্বার বারম্বার করি' উত্তরণ
যাত্রা করে যুগে যুগে অনন্তকালের তীর্থপথে
নব নব পান্থশালে বিচিত্র নূতন দেহরথে,
তাহারি বিজয়ধ্বজা উড়াইলে নিঃশঙ্ক গৌরবে
অজ্ঞাতের সম্মুখে দাঁড়ায়ে। তোমার নিঃশব্দ রবে
প্রথম ভেঙেছে স্বপ্ন ধরিত্রীর, চমকি' উল্লসি'
নিজেরে প'ড়েছে তা'র মনে,—দেবকন্যা দুঃসাহসী

কবে যাত্রা ক'রেছিলো জ্যোতিঃ-স্বর্গ ছাড়ি' দীনবেশে
পাংশুম্লান গৈরিকবসন-পরা,—খণ্ড কালে দেশে
অমরার আনন্দেরে খণ্ড খণ্ড ভোগ করিবারে,
দুঃখের সংঘাতে তা'রে বিদীর্ণ করিয়া বারে বারে
নিবিড় করিয়া পেতে।
মৃত্তিকার হে বীর সন্তান,
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মুক্তিদান
মরুর দারুণ দুর্গ হ'তে; যুদ্ধ চলে ফিরে ফিরে;
সন্তরি' সমুদ্র-উর্ম্মি দুর্গম দ্বীপের শূন্য তীরে
শ্যামলের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিলে অদম্য নিষ্ঠায়,
দুস্তর শৈলের বক্ষে প্রস্তরের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়
বিজয়-আখ্যান-লিপি লিখি' দিলে পল্লব-অক্ষরে
ধূলিরে করিয়া মুগ্ধ, চিহ্নহীন প্রান্তরে প্রান্তরে
ব্যাপিলে আপন পন্থা।
বাণীশূন্য ছিল একদিন
জলস্থল শূন্যতল, ঋতুর উৎসবমন্ত্রহীন,—
শাখায় রচিলে তব সঙ্গীতের আদিম আশ্রয়,
যে-গানে চঞ্চল বায়ু নিজের লভিল পরিচয়,
সুরের বিচিত্র বর্ণে আপনার দৃশ্যহীন তনু
রঞ্জিত করিয়া নিল, অঙ্কিল গানের ইন্দ্রধনু
উত্তরীর প্রান্তে প্রান্তে। সুন্দরের প্রাণমূর্ত্তিখানি
মৃত্তিকার মর্ত্ত্যপটে দিলে তুমি প্রথম বাখানি'
টানিয়া আপন প্রাণে রূপশক্তি সূর্য্যলোক হ'তে,
আলোকের গুপ্তধন বর্ণে বর্ণে বর্ণিলে আলোতে।
ইন্দ্রের অপ্সরী আসি' মেঘে মেঘে হানিয়া কঙ্কণ
বাষ্পপাত্র চূর্ণ করি' লীলানৃত্যে ক'রেছে বর্ষণ

যৌবন-অমৃতরস, তুমি তাই নিলে ভরি' ভরি'
আপনার পত্রপুষ্পপুটে, অনন্তযৌবনা করি'
সাজাইলে বসুন্ধরা।

হে নিস্তব্ধ, হে মহাগম্ভীর,
বীর্য্যেরে বাঁধিয়া ধৈর্য্যে শান্তিরূপ দেখালে শক্তির;
তাই আসি তোমার আশ্রয়ে শান্তিদীক্ষা লভিবারে,
শুনিতে মৌনের মহাবাণী;—দুশ্চিন্তার গুরুভারে
নত শীর্ষ বিলুণ্ঠিতে শ্যামসৌম্যচ্ছায়াতলে তব,—
প্রাণের উদার রূপ, রসরূপ নিত্য নব নব,
বিশ্বজয়ী বীররূপ, ধরণীর বাণীরূপ তা'র
লভিতে আপন প্রাণে। ধ্যানবলে তোমার মাঝার
গেছি আমি, জেনেছি, সূর্য্যের বক্ষে জ্বলে বহ্নিরূপে
সৃষ্টিযজ্ঞে যেই হোম, তোমার সত্তায় চুপে চুপে
ধরে তাই শ্যাম স্নিগ্ধরূপ; ওগো সূর্য্যরশ্মিপায়ী,
শত শত শতাব্দীর দিন-ধেনু দুহিয়া সদাই
যে-তেজে ভরিলে মজ্জা, মানবেরে তাই করি' দান
ক'রেছো জগৎজয়ী; দিলে তা'রে পরম-সম্মান;
হ'য়েছে সে দেবতার প্রতিস্পর্দ্ধী,—সে-অগ্নিচ্ছটায়
প্রদীপ্ত তাহার শক্তি, বিশ্বতলে বিস্ময় ঘটায়
ভেদিয়া দুঃসাধ্য বিঘ্নবাধা। তব প্রাণে প্রাণবান্,
তব স্নেহচ্ছায়ায় শীতল, তব তেজে তেজীয়ান্,
সজ্জিত তোমার মাল্যে যে-মানব, তারি দূত হ'য়ে,
ওগো মানবের বন্ধু, আজি এই কাব্য-অর্ঘ্য ল'য়ে
শ্যামের বাঁশির তানে মুগ্ধ কবি আমি
অর্পিলাম তোমায় প্রণামী॥

৯ই চৈত্র, ১৩৩৩

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

প্রিয় করকমলে

বন্ধু

যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন বাণীহীন মরু,
প্রাণের আনন্দ নিয়ে, শঙ্কা নিয়ে, দুঃখ নিয়ে, তরু
দেখা দিল দারুণ নির্জ্জনে। কত যুগ যুগান্তরে
কান পেতে ছিল স্তব্ধ মানুষের পদশব্দ তরে
নিবিড় গহনতলে। যবে এলো মানব অতিথি,
দিল তা'রে ফুল ফল, বিস্তারিয়া দিল ছায়াবীথি।
প্রাণের আদিমভাষা গূঢ় ছিল তাহার অন্তরে,
সম্পূর্ণ হয়নি ব্যক্ত আন্দোলনে, ইঙ্গিতে, মর্ম্মরে।
তা'র দিন-রজনীর জীবযাত্রা বিশ্ব ধরাতলে
চ'লেছিলো নানা পথে শব্দহীন নিত্যকোলাহলে
সীমাহীন ভবিষ্যতে; আলোকের আঘাতে তনুতে
প্রতিদিন উঠিয়াছে চঞ্চলিত অণুতে অণুতে
স্পন্দবেগে নিঃশব্দ ঝঙ্কারগীতি; নীরব স্তবনে
সূর্য্যের বন্দনাগান গাহিয়াছে প্রভাত পবনে।
প্রাণের প্রথমবাণী এই মতো জাগে চারিভিতে
তৃণে তৃণে বনে বনে, তবু তাহা র'য়েছে নিভৃতে,—
কাছে থেকে শুনি নাই;—হে তপস্বী, তুমি একমনা
নিঃশব্দেরে বাক্য দিলে; অরণ্যের অন্তর-বেদনা
শুনেছো একান্তে বসি'; মূক জীবনের যে-ক্রন্দন
ধরণীর মাতৃবক্ষে নিরন্তর জাগালো স্পন্দন

অঙ্কুরে অঙ্কুরে উঠি', প্রসারিয়া শত ব্যগ্রশাখা,
পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া, শিকড়ে শিকড়ে আঁকাবাঁকা
জন্ম মরণের দ্বন্দ্বে, তাহার রহস্য তব কাছে
বিচিত্র অক্ষররূপে সহসা প্রকাশ লভিয়াছে।
প্রাণের আগ্রহবার্ত্তা নির্ব্বাকের অন্তঃপুর হ'তে
অন্ধকার পার করি' আনি দিলে দৃষ্টির আলোতে।
তোমার প্রতিভাদীপ্ত চিত্তমাঝে কহে আজি কথা
তরুর মর্ম্মর সাথে মানব মর্ম্মের আত্মীয়তা;
প্রাচীন আদিমতম সম্বন্ধের দেয় পরিচয়।
হে সাধকশ্রেষ্ঠ, তব দুঃসাধ্য সাধন লভে জয়;—
সতর্ক দেবতা যেথা গুপ্তবাণী রেখেছেন ঢাকি'
সেথা তুমি দীপহস্তে অন্ধকারে পশিলে একাকী,
জাগ্রত করিলে তা'রে। দেবতা আপন পরাভবে
যেদিন প্রসন্ন হন, সেদিন উদার জয়রবে
ধ্বনিত অমরাবতী আনন্দে রচিয়া দেয় বেদী
বীর বিজয়ীর তরে, যশের পতাকা অভ্রভেদী
মর্ত্ত্যের চূড়ায় উড়ে।
মনে আছে একদা যেদিন
আসন প্রচ্ছন্ন তব, অশ্রদ্ধার অন্ধকারে লীন,
ঈর্ষা-কণ্টকিত পথে চ'লেছিলে ব্যথিত চরণে,
ক্ষুদ্র শত্রুতার সাথে প্রতিক্ষণে অকারণ রণে
হ'য়েছো পীড়িত শ্রান্ত। সে-দুঃখই তোমার পাথেয়,
সে-অগ্নি জ্বেলেছে যাত্রাদীপ, অবজ্ঞা দিয়েছে শ্রেয়,
পেয়েছো সম্বল তব আপনার গভীর অন্তরে।
তোমার খ্যাতির শঙ্খ আজি বাজে দিকে দিগন্তরে

সমুদ্রের এ-কূলে ও-কূলে ; আপন দীপ্তিতে আজি
বন্ধু, তুমি দীপ্যমান ; উচ্ছ্বসি উঠিছে বাজি
বিপুল কীর্ত্তির মন্ত্র তোমার আপন কর্ম্মমাঝে।
জ্যোতিষ্ক সভার তলে যেথা তব আসন বিরাজে
সেথায় সহস্রদীপ জ্বলে আজি দীপালি উৎসবে।
আমারো একটি দীপ তারি সাথে মিলাইনু যবে
চেয়ে দেখো তা'র পানে, এ দীপ বন্ধুর হাতে জ্বালা ;
তোমার তপস্যাক্ষেত্র ছিল যবে নিভৃত নিরালা
বাধায় বেষ্টিত রুদ্ধ, সেদিন সংশয় সন্ধ্যাকালে
কবি-হাতে বরমাল্য সে বন্ধু পরায়েছিল ভালে ;
অপেক্ষা করেনি সে তো জনতার সমর্থন তরে,
দুর্দ্দিনে জ্বেলেছে দীপ রিক্ত তব অর্ঘ্যথালি 'পরে।
আজি সহস্রের সাথে ঘোষিল সে, ধন্য ধন্য তুমি,
ধন্য তব বন্ধুজন, ধন্য তব পুণ্য জন্মভূমি।

শান্তিনিকেতন
১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫

দেবদারু

আমি তখন ছিলেম শিলঙ্ পাহাড়ে, রূপ-ভাবক নন্দলাল ছিলেন কার্সিয়ঙে। তাঁর কাছ থেকে ছোটো একটি পত্রপট পাওয়া গেল, তাতে পাহাড়ের উপর দেওদার গাছের ছবি আঁকা। চেয়ে চেয়ে মনে হ'লো ঐ একটি দেবদারুর মধ্যে যে শ্যামল শক্তির প্রকাশ, সমস্ত পর্ব্বতের চেয়ে তা বড়ো, ঐ দেবদারুকে দেখা গেল হিমালয়ের তপস্যার সিদ্ধিরূপে। মহাকালের চরণপাতে হিমালয়ের প্রতিদিন ক্ষয় হ'চ্চে, কিন্তু দেবদারুর মধ্যে যে প্রাণ, নব নব তরু-দেহের মধ্যে দিয়ে যুগে যুগে তা এগিয়ে চ'ল্‌বে। শিল্পীর পত্রপটের প্রত্যুত্তরে আমি এই কাব্যলিপি পাঠিয়ে দিলেম।

তপোমগ্ন হিমাদ্রির ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করি' চুপে
বিপুল প্রাণের শিখা উচ্ছ্বসিল দেবদারুরূপে।
সূর্য্যের যে-জ্যোতির্মন্ত্র তপস্বীর নিত্য উচ্চারণ
অন্তরের অন্ধকারে, পারিল না করিতে ধারণ
সেই দীপ্ত রুদ্রবাণী,—তপস্যার সৃষ্টিশক্তিবলে
সে-বাণী ধরিল শ্যামকায়া; সবিতার সভাতলে
করিল সাবিত্রীগান; স্পন্দমান ছন্দের মর্ম্মরে
ধরিত্রীর সামগাথা বিস্তারিল অনন্ত অম্বরে।
ঋজু দীর্ঘ দেবদারু—গিরি এ'রে শ্রেষ্ঠ করে জ্ঞান
আপন মহিমা চেয়ে; অন্তরে ছিল যে তা'র ধ্যান

বাহিরে তা সত্য হ'লো ; ঊৰ্দ্ধ হ'তে পেয়েছিলো ঋণ
ঊর্দ্ধপানে অর্ঘ্যরূপে শোধ করি দিল একদিন।
আপন দানের পুণ্যে স্বর্গ তা'র রহিল না দূর,
সূর্য্যের সঙ্গীতে মেশে মৃত্তিকার মুরলীর সুর ॥

শিলঙ্‌,
২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

আম্রবন

সে-বৎসর শান্তিনিকেতন আম্রবীথিকায় বসন্ত-উৎসব হ'য়েছিলো। কেউবা চিত্রে কেউবা কারুশিল্পে কেউবা কাব্যে আপন অর্ঘ্য এনেছিলেন। আমি ঋতুরাজকে নিবেদন ক'রেছিলেম কয়েকটি কবিতা, তা'র মধ্যে নিম্নলিখিত একটি। সেদিন উৎসবে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন—এই আম্রবনের সঙ্গে আমার পরিচয় তাঁদের সকলের চেয়ে পুরাতন—সেই আমার বালককালের আত্মীয়তা এই কবিতার মধ্যে আমার জীবনের পরাহ্নে প্রকাশ ক'রে গেলেম। এই আম্রবনের যে-নিমন্ত্রণ বালকের চিরবিস্মিত হৃদয়ে এসে পৌঁচেছিলো আজ মনে হয় সেই নিমন্ত্রণ যেন আবার আস্‌চে মাটির মেঠো সুর নিয়ে, রৌদ্র-তপ্ত ঘাসের গন্ধ নিয়ে, উত্তেজিত শালিখগুলির কাকলী-বিক্ষুব্ধ অপরাহ্ণের অবকাশ নিয়ে।

তব পথচ্ছায়া বাহি' বাঁশরীতে যে বাজালো আজি
মর্ম্মে মোর অশ্রুত রাগিণী,
ওগো আম্রবন,
তারি স্পর্শে রহি' রহি' আমারো হৃদয় উঠে বাজি',—
চিনি তা'রে কিম্বা নাহি চিনি
কে জানে কেমন!
অন্তরে অন্তরে তব যে-চঞ্চল রসের ব্যগ্রতা
আপন অন্তরে তাহা বুঝি,
ওগো আম্রবন।
তোমার প্রচ্ছন্ন মন আমারি মতন চাহে কথা—
মঞ্জরীতে মুখরিয়া আনন্দের ঘনগূঢ় ব্যথা;
অজানারে খুঁজি'
আমারি মতন আন্দোলন॥

সচকিয়া চিকনিয়া কাঁপে তব কিশলয়রাজি
সর্ব্ব অঙ্গে নিমেষে নিমেষে,
ওগো আম্রবন।
আমিও তো আপনার বিকশিত কল্পনায় সাজি
অন্তর্লীন আনন্দ-আবেশে
অমনি নূতন।
প্রাণে মোর অমনি তো দোলা দেয় সন্ধ্যায় উষায়
অদৃশ্যের নিঃশ্বসিত ধ্বনি,
ওগো আম্রবন।
আমার যে পুষ্পশোভা সে কেবল বাণীর ভূষায়,
নূতন চেতনে চিত্ত আপনারে পরাইতে চায়
সুরের গাঁথনী—
গীতঝঙ্কারের আবরণ॥

যে অজস্রভাষা তব উচ্ছ্বসিয়া উঠেছে কুসুমি'
ভূতলের চিরন্তনী কথা,
ওগো আম্রবন,
তাই ব'হে নিয়ে যাও, আকাশের অন্তরঙ্গ তুমি,
ধরণীর বিরহবারতা
গভীর গোপন।
সে ভাষা সহজে মিশে বাতাসের নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে,
মৌমাছির গুঞ্জনে গুঞ্জনে,
ওগো আম্রবন।

আমার নিভৃত চিত্তে সে ভাষা সহজে চ'লে আসে,
মিশে যায় সঙ্গোপনে অন্তরের আভাসে আশ্বাসে
স্বপনে বেদনে,
ধ্যানে মোর করে সঞ্চরণ ॥

সুদূর জন্মের যেন ভুলে-যাওয়া প্রিয়কণ্ঠস্বর
গন্ধে তব র'য়েছে সঞ্চিত,
ওগো আম্রবন।
যেন নাম-ধ'রে কোন্ কানে কানে গোপন মর্ম্মর
তাই মোরে করে রোমাঞ্চিত
আজি ক্ষণে ক্ষণ।
আমার ভাবনা আজি প্রসারিত তব গন্ধ সনে
জনম মরণ-পরপার,
ওগো আম্রবন,
যেথায় অমরাপুরে সুন্দরের দেউল-প্রাঙ্গণে
জীবনের নিত্য আশা সন্ন্যাসিনী, সন্ধ্যারতি-ক্ষণে
দীপ জ্বালি' তা'র
পূর্ণেরে করিছে সমর্পণ।

বহুকাল চলিয়াছে বসন্তের রসের সঞ্চার
ওই তব মজ্জায় মজ্জায়,
ওগো আম্রবন।
বহুকাল যৌবনের মদোৎফুল্ল পল্লীললনার
আকুলিত অলক-সজ্জায়
জোগালে ভূষণ।

শিকড়ের মুষ্টি দিয়া আঁকড়িয়া যে-বক্ষ পৃথ্বীর
প্রাণরস করো তুমি পান,
ওগো আম্রবন,
সেথা আমি গেঁথে আছি দুদিনের কুটীর মৃত্তির,—
তোমার উৎসবে আমি আজি গাবো এক রজনীর
পথ-চলা গান,
কালি তা'র হবে সমাপন ॥

৫ ফাল্গুন, ১৩৩৪

নীলমণিলতা

শান্তিনিকেতন উত্তরায়ণের একটি কোণের বাড়িতে আমার বাসা ছিল। এই বাসার অঙ্গণে আমার পরলোকগত বন্ধু পিয়র্সন একটি বিদেশী গাছের চারা রোপণ ক'রেছিলেন। অনেককাল অপেক্ষার পরে নীলফুলের স্তবকে স্তবকে একদিন সে আপনার অজস্র পরিচয় অবারিত ক'র্‌লে। নীল রঙে আমার গভীর আনন্দ, তাই এই ফুলের বাণী আমার যাতায়াতের পথে প্রতিদিন আমাকে ডাক দিয়ে বারে বারে স্তব্ধ ক'রেচে। আমার দিক থেকে কবিরও কিছু বল্‌বার ইচ্ছে হ'তো কিন্তু নাম না পেলে সম্ভাষণ করা চলে না। তাই লতাটির নাম দিয়েছি নীলমণিলতা। উপযুক্ত অনুষ্ঠানের দ্বারা সেই নামকরণটি পাকা কর্‌বার জন্যে এই কবিতা। নীলমণি ফুল যেখানে চোখের সামনে ফোটে সেখানে নামের দরকার হয়নি কিন্তু একদা অবসানপ্রায় বসন্তের দিনে দূরে ছিলুম সেদিন রূপের স্মৃতি নামের দাবী ক'রলে। ভক্ত ১০১ নামে দেবতাকে ডাকে সে শুধু বিরহের আকাশকে পরিপূর্ণ করবার জন্যে।

ফাল্গুন-মাধুরী তা'র চরণের মঞ্জীরে মঞ্জীরে
নীলমণি-মঞ্জরীর গুঞ্জন বাজায়ে দিল কি রে?
আকাশ যে-মৌনভার
বহিতে পারে না আর,
নীলিমা-বন্যায় শূন্যে উচ্ছলে অনন্ত ব্যাকুলতা,
তারি ধারা পুষ্পপাত্রে ভরি' নিল নীলমণি লতা॥

পৃথ্বীর গভীর মৌন দূর শৈলে ফেলে নীল ছায়া,
মধ্যাহ্ন-মরীচিকায় দিগন্তে খোঁজে সে স্বপ্ন-কায়া।

যে-মৌন নিজেরে চায়
সমুদ্রের নীলিমায়,
অন্তহীন সেই মৌন উচ্ছ্বসিল নীলগুচ্ছ ফুলে,
দুর্গম রহস্য তা'র উঠিল সহজ ছন্দে দুলে' ॥

আসন্ন মিলনাশ্বাসে বধূর কম্পিত তনুখানি
নীলাম্বর অঞ্চলের গুণ্ঠনে সঞ্চিত করে বাণী।
মর্ম্মের নির্ব্বাক্ কথা
পায় তা'র নিঃসীমতা
নিবিড় নির্ম্মল নীলে ; আনন্দের সেই নীল দ্যুতি
নীলমণি-মঞ্জরীর পুঞ্জে পুঞ্জে প্রকাশে আকূতি ॥

অজানা পান্থের মতো ডাক দিলে অতিথির ডাকে,
অপরূপ পুষ্পোচ্ছ্বাসে, হে লতা, চিনালে আপনাকে।
বেল জুঁই শেফালিরে
জানি আমি ফিরে ফিরে,
কত ফাল্গুনের, কত শ্রাবণের, আশ্বিনের ভাষা
তা'রা তো এনেছে চিত্তে, রঙীন ক'রেছে ভালোবাসা ॥

চাঁপার কাঞ্চন আভা সে-যে কার কণ্ঠস্বরে সাধা,
নাগকেশরের গন্ধ সে-যে কোন্ বেণীবন্ধে বাঁধা।
বাদলের চামেলি-যে
কালো আঁখিজলে ভিজে,
করবীর রাঙা রঙ্ কঙ্কণ-ঝঙ্কার সুরে মাখা,
কদম্ব কেশরগুলি নিদ্রাহীন বেদনায় আঁকা ॥

তুমি সুদূরের দূতী, নূতন এসেছো নীলমণি,
স্বচ্ছ নীলাম্বরসম নির্ম্মল তোমার কণ্ঠধ্বনি।
যেন ইতিহাসজালে
বাঁধা নহ দেশে কালে,
যেন তুমি দৈববাণী বিচিত্র বিশ্বের মাঝখানে,
পরিচয়হীন তব আবির্ভাব, কেন এ কে জানে॥

"কেন এ কে জানে" এই মন্ত্র আজি মোর মনে জাগে;
তাই তো ছন্দের মালা গাঁথি অকারণ অনুরাগে।
বসন্তের নানা ফুলে
গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলে,
আম্রবনে ছায়া কাঁপে মৌমাছির গুঞ্জরণ-গানে;
মেলে অপরূপ ডানা প্রজাপতি, কেন এ কে জানে॥

কেন এ কে জানে এত বর্ণগন্ধ রসের উল্লাস,
প্রাণের মহিমাছবি রূপের গৌরবে পরকাশ।
যেদিন বিতানচ্ছায়ে
মধ্যাহ্নের মন্দবায়ে
ময়ুর আশ্রয় নিল, তোমারে তাহারে একখানে
দেখিলাম চেয়ে চেয়ে, কহিলাম, "কেন এ কে জানে॥"

অভ্যাসের সীমা-টানা চৈতন্যের সঙ্কীর্ণ সঙ্কোচে
ঔদাস্যের ধূলা ওড়ে, আঁখির বিস্ময়রস ঘোচে।

মন জড়তায় ঠেকে
নিখিলেরে জীর্ণ দেখে,
হেনকালে, হে নবীন, তুমি এসে কী বলিলে কানে ;
বিশ্বপানে চাহিলাম, কহিলাম, "কেন এ কে জানে।"

আমি আজ কোথা আছি, প্রবাসে অতিথিশালা মাঝে।
তব নীল-লাবণ্যের বংশীধ্বনি দূর শূন্যে বাজে।
আসে বৎসরের শেষ,
চৈত্র ধরে ম্লান বেশ,
হয়তো বা রিক্ত তুমি ফুল-ফোটাবার অবসানে,
তবু, হে অপূর্ব্ব রূপ, দেখা দিলে কেন যে কে জানে ॥

ভরতপুর,
১৭ই চৈত্র, ১৩৩৩

কুরচি

অনেককাল পূর্ব্বে শিলাইদহ থেকে কল্‌কাতায় আস্‌ছিলেম। কুষ্টিয়া ষ্টেশন-ঘরের পিছনের দেয়াল-ঘেঁষা এক কুরচি গাছ চোখে পড়্‌লো। সমস্ত গাছটি ফুলের ঐশ্বর্য্যে মহিমান্বিত। চারিদিকে হাটবাজার; একদিকে রেলের লাইন, অন্যদিকে গোরুর গাড়ির ভিড়, বাতাস ধূলোয় নিবিড়। এমন অজায়গায় পি, ডব্ল্যু, ডির স্বরচিত প্রাচীরের গায়ে ঠেষ দিয়ে এই একটি কুরচি গাছ তা'র সমস্ত শক্তিতে বসন্তের জয় ঘোষণা ক'র্‌চে—উপেক্ষিত বসন্তের প্রতি তা'র অভিবাদন সমস্ত হট্টগোলের উপরে যাতে ছাড়িয়ে ওঠে এই যেন তা'র প্রাণপণ চেষ্টা। কুরচির সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়।

ভ্রমর একদা ছিল পদ্মবনপ্রিয়
ছিল প্রীতি কুমুদিনী পানে।
সহসা বিদেশে আসি হায়, আজ কি ও
কুটজেও বন্ধু বলি' মানে!

—সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের অনুবাদ

কুর্‌চি, তোমার লাগি পদ্মেরে ভুলেছে অন্যমনা
যে-ভ্রমর, শুনি না কি তা'রে কবি ক'রেছে ভর্ৎসনা।
আমি সেই ভ্রমরের দলে। তুমি আভিজাত্যহীনা,
নামের গৌরবহারা; শ্বেতভুজা ভারতীর বীণা
তোমারে করেনি অভ্যর্থনা অলঙ্কার-ঝঙ্কারিত
কাব্যের মন্দিরে। তবু সেথা তব স্থান অবারিত,
বিশ্বলক্ষ্মী ক'রেছেন আমন্ত্রণ যে-প্রাঙ্গণতলে
প্রসাদচিহ্নিত তাঁর নিত্যকার অতিথির দলে।
আমি কবি লজ্জা পাই কবির অন্যায় অবিচারে
হে সুন্দরী। শাস্ত্রদৃষ্টি দিয়ে তা'রা দেখেছে তোমারে,

রসদৃষ্টি দিয়ে নহে ; শুভদৃষ্টি কোনো স্থলগনে
ঘটিতে পারেনি তাই, ঔদাস্যের মোহ-আবরণে
রহিলে কুণ্ঠিত হ'য়ে।
তোমারে দেখেছি সেই কবে
নগরে হাটের ধারে, জনতার নিত্য কলরবে,—
ইটকাঠপাথরের শাসনের সঙ্কীর্ণ আড়ালে,
প্রাচীরের বহিঃপ্রান্তে।—সূর্য্যপানে চাহিয়া দাঁড়ালে
সকরুণ অভিমানে ;—সহসা প'ড়েছে যেন মনে
একদিন ছিলে যবে মহেন্দ্রের নন্দন-কাননে—
পারিজাত-মঞ্জরীর লীলার সঙ্গিনীরূপ ধরি'
চিরবসন্তের স্বর্গে,—ইন্দ্রাণীর সাজাতে কবরী ;
অপ্সরীর নৃত্যলোল মণিবন্ধে কঙ্কণবন্ধনে
পেতে দোল তালে তালে ; পূর্ণিমার অমল চন্দনে
মাখা হ'য়ে নিঃশ্বসিতে চন্দ্রমার বক্ষোহার 'পরে।
অদূরে কঙ্কর-রুক্ষ লৌহপথে কঠোর ঘর্ঘরে
চ'লেছে আগ্নেয়রথ, পণ্যভারে কম্পিত ধরায়
ঔদ্ধত্য বিস্তারি' বেগে ; কটাক্ষে কেহ না ফিরে চায়
অর্থমূল্যহীন তোমাপানে, হে তুমি দেবের প্রিয়া,
স্বর্গের দুলালী। যবে নাটমন্দিরের পথ দিয়া
বেসুর অসুর চলে, সেইক্ষণে তুমি একাকিনী
দক্ষিণ বায়ুর ছন্দে বাজায়েছ সুগন্ধ কিঙ্কিণী
বসন্তবন্দনানৃত্যে,—অবজ্ঞিয়া অন্ধ অবজ্ঞারে,
ঐশ্বর্য্যের ছদ্মবেশী ধূলির দুঃসহ অহঙ্কারে
হানিয়া মধুর হাস্য ; শাখায় শাখায় উচ্ছ্বসিত
ক্লান্তিহীন সৌন্দর্য্যের আত্মহারা অজস্র অমৃত
ক'রেছো নিঃশব্দ নিবেদন।

মোর মুগ্ধ চিত্তময়
সেইদিন অকস্মাৎ আমার প্রথম পরিচয়
তোমা সাথে। অনাদৃত বসন্তেরে আবাহন গীতে
প্রণমিয়া, উপেক্ষিতা, শুভক্ষণে কৃতজ্ঞ এ চিতে
পদার্পিলে অক্ষয় গৌরবে। সেইক্ষণে জানিলাম,
হে আত্মবিস্মৃত তুমি, ধরাতলে সত্য তব নাম
সকলেই ভুলে গেছে, সে নাম প্রকাশ নাহি পায়
চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থে পণ্ডিতের পুঁথির পাতায়;
গ্রামের গাথার ছন্দে সে নাম হয়নি আজো লেখা,
গানে পায় নাই সুর।—সে নাম কেবল জানে একা
আকাশের সূর্য্যদেব, তিনি তাঁর আলোক-বীণায়
সে নামে ঝঙ্কার দেন, সেই সুর ধূলিরে চিনায়
অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য তা'র; সে সুরে গোপন বার্ত্তা জানি'
সন্ধানী বসন্ত হাসে। স্বর্গ হ'তে চুরি ক'রে আনি'
এ ধরা, বেদের মেয়ে, তোরে রাখে কুটীরে কানাচে
কটুনামে লুকাইয়া, হঠাৎ পড়িস্ ধরা পাছে।
পণ্যের কর্কশধ্বনি এ নামে কদর্য্য আবরণ
রচিয়াছে; তাই তোরে দেবী ভারতীর পদ্মবন
মানে নি স্বজাতি ব'লে, ছন্দ তোরে করে পরিহার,—
তা ব'লে হবে কি ক্ষুণ্ণ কিছুমাত্র তোর শুচিতার?
সূর্য্যের আলোর ভাষা আমি কবি কিছু কিছু চিনি,
কুর্‌চি, প'ড়েছো ধরা, তুমিই রবির আদরিণী॥

শান্তিনিকেতন,
১০ই বৈশাখ, ১৩৩৪

শাল

প্রায় ত্রিশ বছর হ'লো শান্তিনিকেতনের শালবীথিকায় আমার সেদিনকার এক কিশোর কবিবন্ধুকে পাশে নিয়ে অনেক দিন অনেক সায়াহ্নে পায়চারী ক'রেচি। তাকে অন্তরের গভীর কথা বলা বড়ো সহজ ছিল। সেই আমাদের যত আলাপগুঞ্জরিত রাত্রি, আশ্রম-বাসের ইতিহাসে আমার চিরন্তন স্মৃতিগুলির সঙ্গেই গ্রথিত হ'য়ে আছে। সে কবি আজ ইহলোকে নেই। পৃথিবীতে মানুষের প্রিয়-সঙ্গের কত ধারা কত নিভৃত পথ দিয়ে চ'লেচে। এই স্তব্ধ তরুশ্রেণীর প্রাচীন ছায়ায় সেই ধারা তেমন ক'রে আরো অনেক ব'য়ে গেচে, আরো অনেক বইবে। আমরা চ'লে যাবো কিন্তু কালে কালে বারে বারে বন্ধুসঙ্গমের জন্য এই ছায়াতল র'য়ে গেল। যেমন অতীতের কথা ভাব্‌চি—তেমনি ঐ শালশ্রেণীর দিকে চেয়ে বহুদূর ভবিষ্যতের ছবিও মনে আস্‌চে।

বাহিরে যখন ক্ষুব্ধ দক্ষিণের মদির পবন
অরণ্যে বিস্তারে অধীরতা; যবে কিংশুকের বন
উচ্ছৃঙ্খল রক্তরাগে স্পর্দ্ধায় উদ্যত; দিশিদিশি
শিমুল ছড়ায় ফাগ; কোকিলের গান অহর্নিশি
জানেনা সংযম, যবে বকুল অজস্র সর্ব্বনাশে
স্খলিত দলিত বনপথে, তখন তোমার পাশে
আসি আমি হে তপস্বী শাল, যেথায় মহিমারাশি
পুঞ্জিত ক'রেছো অভ্রভেদী, যেথা র'য়েছো বিকাশি'
দিগন্তে গম্ভীর শান্তি। অন্তরের নিগূঢ় গভীরে
ফুল ফুটাবার ধ্যানে নিবিষ্ট র'য়েছো ঊর্দ্ধশিরে;

চৌদিকের চঞ্চলতা পশে না সেথায়। অন্ধকারে
নিঃশব্দ সৃষ্টির মন্ত্র নাড়ী বেয়ে শাখায় সঞ্চারে ;
সে অমৃত মন্ত্র-তেজ নিলে ধরি' সূর্য্যলোক হ'তে
নিভৃত মর্ম্মের মাঝে ; স্নান করি' আলোকের স্রোতে
শুনি' নিলে নীল আকাশের শান্তিবাণী ; তা'র পরে
আত্মসমাহিত তুমি, স্তব্ধ তুমি,—বৎসরে বৎসরে
বিশ্বের প্রকাশ-যজ্ঞে বারম্বার করিতেছ দান
নিপুণ সুন্দর তব কমণ্ডলু হ'তে অফুরান
পুণ্যগন্ধী প্রাণধারা ; সে ধারা চ'লেছে ধীরে ধীরে
দিগন্তে শ্যামল উর্ম্মি উচ্ছ্বাসিয়া, দূর শতাব্দীরে
শুনাতে মর্ম্মর আশীর্ব্বাণী। (রাজার সাম্রাজ্য কত শত
কালের বন্যায় ভাসে, ফেটে যায় বুদ্বুদের মতো,
মানুষের ইতিবৃত্ত সুদুর্গম গৌরবের পথে
কিছুদূর যায়, আর বারম্বার ভগ্নচূর্ণ রথে
কীর্ণ করে ধূলি। তারি মাঝে উদার তোমার স্থিতি,
ওগো মহা শাল, তুমি সুবিশাল কালের অতিথি ;
আকাশেরে দাও সঙ্গ বর্ণরঙ্গে শাখার ভঙ্গীতে,
বাতাসেরে দাও মৈত্রী পল্লবের মর্ম্মর সঙ্গীতে,
মঞ্জরীর গন্ধের গণ্ডূষে। যুগে যুগে কত কাল
পথিক এসেছে তব ছায়াতলে, ব'সেছে রাখাল,
শাখায় বেঁধেছে নীড় পাখী ; যায় তা'রা পথ বাহি'
আসন্ন বিস্মৃতি পানে, উদাসীন তুমি আছ চাহি'।)
নিত্যের মালার সূত্রে অনিত্যের যত অক্ষগুটি
অস্তিত্বের আবর্ত্তনে দ্রুতবেগে চলে তা'রা ছুটি' ;
মর্ত্ত্যপ্রাণ তাহাদের ক্ষণেক পরশ করে যেই
পায় তা'রা জপ-নাম, তা'র পরে আর তা'রা নেই,

নেমে যায় অসংখ্যের তলে। ‹সেই চ'লে-যাওয়া দল
রেখে দিয়ে গেছে যেন ক্ষণিকের কলকোলাহল
দক্ষিণ হাওয়ায় কাঁপা ওই তব পত্রের কল্লোলে,
শাখার দোলায়। ওই ধ্বনি স্মরণে জাগায়ে তোলে
কিশোর বন্ধুরে মোর।› কতদিন এই পাতা-ঝরা
বীথিকায়, পুষ্পগন্ধে বসন্তের আগমনী-ভরা
সায়াহ্নে দুজনে মোরা ছায়াতে অঙ্কিত চন্দ্রালোকে
ফিরেছি গুঞ্জিত আলাপনে। তা'র সেই মুগ্ধ চোখে
বিশ্ব দেখা দিয়েছিলো নন্দন-মন্দার রঙে রাঙা;
যৌবন-তুফান-লাগা সেদিনের কত নিদ্রা-ভাঙা
জ্যোৎস্নামুগ্ধ রজনীর সৌহার্দ্দ্যের সুধারসধারা
তোমার ছায়ার মাঝে দেখা দিল, হ'য়ে গেল সারা।
গভীর আনন্দক্ষণ কতদিন তব মঞ্জরীতে
একান্ত মিশিয়াছিল একখানি অখণ্ড সঙ্গীতে
আলোকে আলাপে হাস্যে, বনের চঞ্চল আন্দোলনে,
বাতাসের উদাস নিঃশ্বাসে।
প্রীতিমিলনের ক্ষণে
সেদিনের প্রিয় সে কোথায়, বর্ষে বর্ষে দোলা দিত
যাহার প্রাণের বেগ উৎসব করিয়া তরঙ্গিত।
তোমার বীথিকাতলে তা'র মুক্ত জীবন-প্রবাহ
আনন্দ-চঞ্চল গতি মিলায়েছে আপন উৎসাহ
পুষ্পিত উৎসাহে তব। হায়, আজি তব পত্র-দোলে
সেদিনের স্পর্শ নাই। তাই এই বসন্ত-কল্লোলে,
পূর্ণিমার পূর্ণতায়, দেবতার অমৃতের দানে
মর্ত্ত্যের বেদনা মেশে।
চাহি আজ দূর পানে

স্বপ্নচ্ছবি চোখে ভাসে,—ভাবী কোন্ ফাল্গুনের রাতে
দোল-পূর্ণিমায়, সাজাতে আসিছে কা'রা পদ্মপাতে
পলাশ বকুল চাঁপা, আলিম্পন-লেখা এঁকে দিতে
তব ছায়া-বেদিকায়, বসন্তের আবাহন গীতে
প্রসন্ন করিতে তব পুষ্প-বরিষণ। সে-উৎসবে
আজিকার এই দিন পথপ্রান্তে লুণ্ঠিত নীরবে।
কোলে তা'র প'ড়ে আছে এ-রাত্রির উৎসবের ডালা।
আজিকার অর্ঘ্যে আছে যতগুলি সুরে-গাঁথা মালা,
কিছু তা'র শুকায়েছে, কিছু তা'র আছে অমলিন;
দুয়েকটি তুলে' নিল যাত্রীদল; সে-দিন এ-দিন
দোঁহে দোঁহা মুখ চেয়ে বদল করিয়া নিল মালা,—
নূতনে ও পুরাতনে পূর্ণ হ'লো বসন্তের পালা॥

৭ ফাল্গুন, ১৩৩৪

মধু-মঞ্জরী

এ লতার কোনো একটা বিদেশী নাম নিশ্চয় আছে—জানিনে, জানার দরকারও নেই। আমাদের দেশের মন্দিরে এই লতার ফুলের ব্যবহার চলে না,—কিন্তু মন্দিরের বাহিরের যে দেবতা মুক্তস্বরূপে আছেন তাঁর প্রচুর প্রসন্নতা এর মধ্যে বিকশিত। কাব্যসরস্বতী কোনো মন্দিরের বন্দিনী দেবতা নন, তাঁর ব্যবহারে এই ফুলকে লাগাবো ঠিক ক'রেচি, তাই নতুন ক'রে নাম দিতে হ'লো। রূপে রসে এর মধ্যে বিদেশী কিছুই নেই, এদেশের হাওয়ায় মাটিতে এর একটুও বিতৃষ্ণা দেখা যায় না, তাই দিশী নামে এ'কে আপন ক'রে নিলেম।

প্রত্যাশী হ'য়ে ছিনু এত কাল ধরি',
বসন্তে আজ দুয়ারে, আ মরি মরি,
ফুল-মাধুরীর অঞ্জলি দিল ভরি'
মধু-মঞ্জরীলতা।

কতদিন আমি দেখিতে এসেছি প্রাতে
কচি ডালগুলি ভরি' নিয়ে কচি পাতে
আপন ভাষায় যেন আলোকের সাথে
কহিতে চেয়েছে কথা॥

কতদিন আমি দেখেছি গোধূলি কালে
সোনালি ছায়ার পরশ লেগেছে ডালে,
সন্ধ্যাবায়ুর মৃদু-কাঁপনের তালে
কী যেন ছন্দ শোনে।

গহন নিশীথে ঝিল্লি যখন ডাকে,
দেখেছি চাহিয়া জড়িত ডালের ফাঁকে
কাল-পুরুষের ইঙ্গিত যেন কা'কে
দূর দিগন্ত-কোণে ॥

শ্রাবণে সঘন ধারা ঝরে ঝরঝর
পাতায় পাতায় কেঁপে ওঠে থরথর,
মনে হয় ওর হিয়া যেন ভর-ভর
বিশ্বের বেদনাতে।

কতবার ওর মর্ম্মে গিয়েছি চলি'
বুঝিতে পেরেছি কেন উঠে চঞ্চলি,
শরৎ শিশিরে যখন সে ঝলমলি'
শিহরায় পাতে পাতে ॥

ভুবনে ভুবনে যে-প্রাণ সীমানা-হারা
গগনে গগনে সিঞ্চিল গ্রহতারা
পল্লবপুটে ধরি' লয় তারি ধারা,
মজ্জায় লহে ভরি'।

কী নিবিড় যোগ এই বাতাসের সনে,
যেন সে পরশ পায় জননীর স্তনে,
সে পুলকখানি কত-যে, সে মোর মনে
বুঝিব কেমন করি' ॥

বাতাসে আকাশে আলোকের মাঝখানে—
ঋতুর হাতের মায়ামন্ত্রের টানে
কী-যে বাণী আছে প্রাণে প্রাণে ওই জানে,
মন তা জানিবে কিসে ?

যে-ইন্দ্রজাল দ্যুলোকে ভূলোকে ছাওয়া,
বুকের ভিতর লাগে ওর তারি হাওয়া,—
বুঝিতে যে চাই কেমন সে ওর পাওয়া,
চেয়ে থাকি অনিমিষে ॥

ফুলের গুচ্ছে আজি ও উচ্ছ্বসিত,
নিখিল-বাণীর রসের পরশামৃত
গোপনে গোপনে পেয়েছে অপরিমিত
ধরিতে না পারে তা'রে।

ছন্দে গন্ধে রূপ-আনন্দে ভরা,
ধরণীর ধন গগনের মন-হরা,
শ্যামলের বীণা বাজিল মধুস্বরা
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে ॥

আমার দুয়ারে এসেছিলো নাম ভুলি'
পাতা-ঝলমল অঙ্কুরখানি তুলি'
মোর আঁখিপানে চেয়েছিলো দুলি' দুলি'
করুণ প্রশ্ন-রতা।

তারপরে কবে দাঁড়ালো যেদিন ভোরে
ফুলে ফুলে তা'র পরিচয়লিপি ধ'রে
নাম দিয়ে আমি নিলাম আপন ক'রে
মধু-মঞ্জরীলতা ॥

তারপরে যবে চ'লে যাবো অবশেষে
সকল ঋতুর অতীত নীরব দেশে,
তখনো জাগাবে বসন্ত ফিরে এসে
ফুল-ফোটাবার ব্যথা।

বরষে বরষে সেদিনো তো বারে বারে
এমনি করিয়া শূন্য ঘরের দ্বারে
এই লতা মোর আনিবে কুসুমভারে
ফাগুনের আকুলতা ॥

তব পানে মোর ছিল যে প্রাণের প্রীতি
ওর কিশলয়ে রূপ নেবে সেই স্মৃতি,
মধুর গন্ধে আভাসিবে নিতি নিতি
সে মোর গোপন কথা।

অনেক কাহিনী যাবে যে সেদিন ভুলে,
স্মরণ-চিহ্ন কত যাবে উন্মূলে;
মোর দেওয়া নাম লেখা থাক্ ওর ফুলে
মধু-মঞ্জরীলতা ॥

নারিকেল

সমুদ্রের ধারে জমিতেই নারিকেলের সহজ আবাস। আমাদের আশ্রমের মাঠ সেই সমুদ্র-কূল থেকে বহুদূরে। এখানে অনেক যত্নে একটি নারিকেলকে পালন ক'রে তোলা হ'য়েচে—সে নিঃসঙ্গ, নিষ্ফল, নিস্তেজ। তাকে দেখে মনে হয় সে যেন প্রাণপণে ঋজু হ'য়ে দাঁড়িয়ে দিগন্ত অতিক্রম ক'রে কোনো এক আকাঙ্ক্ষার ধনকে দেখবার চেষ্টা ক'রচে। নির্ব্বাসিত তরুর মজ্জার মধ্যে সেই আকাঙ্ক্ষা। এখানে আলোণা মাটিতে সমুদ্রের স্পর্শমাত্র নেই, গাছের শিকড় তা'র বাঞ্ছিত রস এখানে সন্ধান ক'রচে, পাচ্চে না; সে উপবাসী, ধরণীর কাছে তা'র কান্নার সাড়া মিল্‌চে না। আকাশে উদ্যত হ'য়ে উঠে তা'র যে-সন্ধানদৃষ্টিকে সে দিগন্তপারে পাঠাচ্চে, দিনান্তে সন্ধ্যাবেলায় সেই তা'র সন্ধানেরই সজীব মূর্ত্তির মতো পাখী তা'র দোদুল্যমান শাখায় প্রতিদিন ফিরে ফিরে আসে।

আজ বসন্তে প্রথম কোকিল ডেকে উঠ্‌লো। দক্ষিণ হাওয়ায় আজ কি সমুদ্রের বাণী এসে পৌঁছলো, যে-বাণী সমুদ্রের কূলে কূলে বধির মাটির সুপ্তিকে নিয়তই অশান্ত তরঙ্গমন্ত্রে আন্দোলিত ক'রে তুল্‌চে? তাই কি আজ সেই দক্ষিণ সমুদ্র থেকে তা'র তাণ্ডব-নৃত্যের স্পর্শ এই গাছের শাখায় শাখায় চঞ্চল? সমুদ্রের রুদ্র ডমরুর জাগরণী কি এরই পল্লব-মর্ম্মরে তা'র ক্ষীণ প্রতিধ্বনি জাগিয়েচে? বিরহী তরু কি আজ আপন অন্তরে সেই সুদূর বন্ধুর বার্ত্তা পেলো, যে-বন্ধুর মহাগানে অভিনন্দিত হ'য়ে কোন্ অতীত যুগে একদিন কোনো প্রথম নারিকেল, প্রাণযাত্রীরূপে জীবলোকে যাত্রা সুরু ক'রেছিলো? সেই যুগারম্ভ প্রভাতের আদিম উৎসবে মহাপ্রাণের যে-স্পর্শপুলক জেগেছিলো তাই আজ ফিরে পেয়ে কি ঐ গাছটির সম্বৎসরের অবসাদ আজ বসন্তে ঘুচ্‌লো? তা'র জীবনের জয়পতাকা আবার আজ কি ঐ নব উৎসাহে নীলাম্বরে আন্দোলিত? যেন একটা আচ্ছাদন উঠে গেল, তা'র মজ্জার মধ্যে প্রাণশক্তির যে-আশ্বাসবাণী প্রচ্ছন্ন হ'য়েছিলো তাকেই আজ কি ফিরে পেলে, যে-বাণী ব'ল্‌চে—"চলো প্রাণতীর্থে, জয় করো মৃত্যুকে।"

সমুদ্রের কূল হ'তে বহুদূরে শব্দহীন মাঠে
নিঃসঙ্গ প্রবাস তব, নারিকেল,—দিনরাত্রি কাটে
যে-প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষায় বুঝিতে পারো না তাহা নিজে।
দিগন্তেরে অতিক্রমি' দেখিতে চাহিছ তুমি কী-যে
দীর্ঘ করি' দেহ তব, মজ্জায় র'য়েছে তা'র স্মৃতি
গূঢ় হ'য়ে।> মাটির গভীরে যে-রস খুঁজিছ নিতি
কী স্বাদ পাও না তাহে, অন্নে তা'র কী অভাব আছে,
তাই তো শিকড় উপবাসী কাঁদে ধরণীর কাছে।
আকাশে র'য়েছো চেয়ে রাত্রিদিন কিসের প্রত্যাশে
বাক্যহারা! বারবার শূন্য হ'তে ফিরে ফিরে আসে
তোমার সন্ধানরূপী সন্ধ্যাবেলাকার শ্রান্ত পাখী
লম্বিত শাখায় তব।
ঐ শুন উঠিয়াছে ডাকি'
বসন্তের প্রথম কোকিল। সে বাণী কি এলো প্রাণে
দক্ষিণ পবন হ'তে, যে বাণী সমুদ্র শুধু জানে;
পৃথিবীর কূলে কূলে যে বাণী গম্ভীর আন্দোলনে
বধির মাটির সুপ্তি কাঁপায়ে তুলিছে প্রতিক্ষণে
অশান্ত-তরঙ্গ-মন্দ্রে, দক্ষিণ সাগর হ'তে একি
তাণ্ডব নৃত্যের স্পর্শ শাখার হিল্লোলে তব দেখি
মুহুর্মুহু চঞ্চলিত?
রুদ্র ডমরুর জাগরণী
পল্লব-মর্ম্মরে তব পেয়েছে কি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি?
কান পেতে ছিলে তুমি,—হে বিরহী, বসন্তে কি আজি
সুদূর বন্ধুর বার্ত্তা অন্তরে উঠিল তব বাজি',—
যে বন্ধুর মহাগানে একদিন সূর্য্যের আলোতে
রোমাঞ্চিয়া বাহিরিলে, প্রাণ-যাত্রী, অন্ধকার হ'তে?

আজি কি পেয়েছো ফিরে প্রাণের পরশ-হর্ষ সেই
যুগারম্ভ প্রভাতের আদি উৎসবের ?—নিমেষেই
অবসাদ দূরে গেল, জীবনের বিজয়-পতাকা
আবার চঞ্চল হ'লো নীলাম্বরে, খুলে গেল ঢাকা,
খুঁজে পেলে, যে আশ্বাস অন্তরে কহিছে রাত্রিদিন—
"প্রাণ-তীর্থে চলো, মৃত্যু করো জয়, শ্রান্তিক্লান্তিহীন ॥"

চামেলি-বিতান

চামেলি-বিতানের নীচের ছায়ায় আমি ব'সতুম—ময়ূর এসে ব'স্‌তো উপরে, লতার আশ্রয়-বেষ্টনী থেকে পুচ্ছ ঝুলিয়ে। জানি সে আমাকে কিছু-মাত্র সম্মান ক'রতো না, কিন্তু সৌন্দর্য্যের যে অর্ঘ্যভার সে বহন করে বেড়াতো তা'র অজ্ঞাতে আমি নিজেই সেটি প্রতিদিন গ্রহণ ক'রেচি। এমন অসঙ্কোচে সে যে দেখা দিয়ে যায় এ'তে আমি কৃতজ্ঞ ছিলুম, সে যে আমাকে ভয় করেনি এ আমার সৌভাগ্য। আরো তা'র কয়েকটি সঙ্গী সঙ্গিনী ছিল কিন্তু দূরের দুরাশায় ওদের কোথায় টেনে নিয়ে গেল, আমিও চলে এসেচি সেই চামেলির সুগন্ধি ছায়ার আশ্রয় থেকে অন্য জায়গায়। বাইরে থেকে এই পরিবর্ত্তনগুলি বেশি কিছু নয়, তবু অন্তরের মধ্যে ভাঙাচোরার দাগ কিছু কিছু থেকে যায়। শুনেছিলুম আমাদের প্রদেশে কোনো এক নদীগর্ভজাত দ্বীপ ময়ূরের আশ্রয়। ময়ূর হিন্দুর অবধ্য। মৃগয়া-বিলাসী ইংরেজ এই দ্বীপের নিষেধকে উপেক্ষা ক'রতে পারেনি অথচ গুলি ক'রে ময়ূর মারবার প্রবল আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়া তা'র পক্ষে অসম্ভব হওয়াতে পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপে খাদ্যের প্রলোভন বিস্তার ক'রে ভুলিয়ে নিয়ে এসে ময়ূর মারতো। বাল্মীকির শাপকে এ যুগের কবি পুনরায় প্রচার না ক'রে থাকতে পারলো না।

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বং
অগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।

ময়ূর, করোনি মোরে ভয়,
সেই গর্ব্ব, সেই মোর জয়।
বাহিরেতে আমলকী
করিতেছে ঝকমকি,
বটের উঠেছে কচি পাতা,

হোথায় দুয়ার থেকে
আমারে গিয়েছো দেখে,
খুলিয়া ব'সেছি মোটা খাতা।
লিখিতেছি নিজ মনে,—
হেরি' তাই আঁখিকোণে
অবজ্ঞায় ফিরে যাও চলি',
বোঝোনা, লেখনী ধরি'
কী যে এত খুঁটে মরি,
আমারে জেনেছো মূঢ় বলি'॥

সেই ভালো' জানো যদি তাই,
তাহে মোর কোনো খেদ নাই।
তবু আমি খুসি আছি,
আসো তুমি কাছাকাছি,
মোরে দেখে নাহি করো ত্রাস।
‹যদিও মানব, তবু
আমারে ক'রো না কভু
দানব বলিয়া অবিশ্বাস।
সুন্দরের দূত তুমি,
এ ধূলির মর্ত্ত্যভূমি,
স্বর্গের প্রসাদ হেথা আনো।›
তবুও বধি না তোরে,
বাঁধি না পিঞ্জরে ধ'রে,
এও কি আশ্চর্য্য নাহি মানো॥

কাননের এই এক কোণা,—
হেথায় তোমার আনাগোনা।
চামেলি-বিতানতল
মোর বসিবার স্থল,
দিন যবে অবসান হয়।
‹হেথা আসো কী যে ভাবি',
মোর চেয়ে তোর দাবী
বেশি বই কম কিছু নয়।›
জ্যোৎস্না ডালের ফাঁকে
হেথা আল্‌পনা আঁকে,
এ নিকুঞ্জ জানো আপনার।
কচি পাতা যে বিশ্বাসে
দ্বিধাহীন হেথা আসে,
তোমার তেমনি অধিকার॥

বর্ণহীন রিক্ত মোর সাজ,
তারি লাগি পাছে পাই লাজ,
বর্ণে বর্ণে আমি তাই
ছন্দ রচিবারে চাই,
সুরে সুরে গীত চিত্র করি।
আকাশেরে বাসি ভালো,
সকাল সন্ধ্যার আলো
আমার প্রাণের বর্ণে ভরি।
ধরায় যেখানে, তাই,
তোমার গৌরব-ঠাঁই
সেথায় আমারো ঠাঁই হয়।

সুন্দরের অনুরাগে
তাই মোর গর্ব্ব লাগে,
মোরে তুমি করো নাই ভয় ॥

তোমার আমার তরে জানি
মধুরের এই রাজধানী।
তোর নাচ, মোর গীতি,
রূপ তোর, মোর প্রীতি,
তোর বর্ণ, আমার বর্ণনা,—
শোভনের নিমন্ত্রণে
চলি মোরা দুইজনে,
তাই তুই আমার আপনা।
সহজ রঙ্গের রঙ্গী
ওই যে গ্রীবার ভঙ্গী,
বিস্ময়ের নাহি পাই পার।
তুমি-যে শঙ্কা না পাও,
নিঃসংশয়ে আসো যাও,
এই মোর নিত্য পুরস্কার ॥

নাশ করে যে আগ্নেয় বাণ
মুহূর্ত্তে অমূল্য তোর প্রাণ—
তা'র লাগি বসুন্ধরা
হয়নি সবুজে ভরা,
তা'র লাগি ফুল নাহি ধরে।

যে-বসন্ত প্রাণে প্রাণে
বেদনার সুধা আনে
সে-বসন্ত নহে তা'র তরে।
ছন্দ ভেঙে দেয় সে যে,
অকস্মাৎ উঠে বেজে
অর্থহীন চকিত চীৎকার,
ধূমাচ্ছন্ন অবিশ্বাস
বিশ্ববক্ষে হানে ত্রাস,
কুটিল সংশয় কদাকার ॥

সৃষ্টিছাড়া এই-যে উৎপাত
হানে দানবের পদাঘাত
পুণ্য পৃথিবীর শিরে,—
তা'র লজ্জা তুই কিরে
আনিতে পারিবি তোর মনে ?
অকৃতজ্ঞ নিষ্ঠুরতা
সৌন্দর্য্যেরে দেয় ব্যথা
কেন যে তা বুঝিবি কেমনে ?
কেন যে কদর্য্য ভাষা
বিধাতার ভালোবাসা
বিদ্রূপে করিছে ছারখার,
যে হস্ত দানেরি তরে
তারি রক্তপাত করে,
সেই লজ্জা নিখিলজনার ॥

পরদেশী

পিয়র্সন্ কয়েক জোড়া সবুজরঙের বিদেশী পাখী আশ্রমে ছেড়ে দিয়েছিলেন। অনেক দিন তা'রা এখানে বাসা বেঁধে ছিল। আজকাল আর দেখ্‌তে পাইনে। আশা করি কোনো নালিশ নিয়ে তা'রা চ'লে যায়নি, কিম্বা এখানকার অন্য আশ্রমিক পশুপাখীর সঙ্গে বর্ণভেদ বা স্বরের পার্থক্য নিয়ে তাদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটেনি।

এনেছে কবে বিদেশী সখা
বিদেশী পাখী আমার বনে,
সকাল সাঁঝে কুঞ্জমাঝে
উঠিছে ডাকি' সহজ মনে।
অজানা এই সাগর পারে
হ'লো না তা'র গানের ক্ষতি।
সবুজ তা'র ডানার আভা,
চপল তা'র নাচের গতি।
আমার দেশে যে-মেঘ এসে
নীপবনের মরমে মেশে,
বিদেশী পাখী গীতালি দিয়ে
মিতালি করে তাহার সনে॥

বটের ফলে আরতি তা'র,
র'য়েছে লোভ নিমের তরে,
বন-জামেরে চঞ্চু তা'র
অচেনা ব'লে দোষী না করে।

শরতে যবে শিশির বায়ে
উচ্ছসিত শিউলি-বীথি,
বাণীরে তা'র করে না ম্লান
কুহেলি-ঘন পুরাণো স্মৃতি।
শালের ফুল-ফোটার বেলা
মধু-কাঙালী লোভীর মেলা,
চির-মধুর বঁধুর মতো
সে ফুল তা'র হৃদয় হরে॥

বেণুবনের আগের ডালে
চটুল ফিঙা যখন নাচে
পরদেশী এ পাখীর সাথে
পরাণে তা'র ভেদ কি আছে?
ঊষার ছোঁওয়া জাগায় ওরে
ছাতিম শাখে পাতার কোলে,
চোখের আগে যে-ছবি জাগে
মানে না তা'রে প্রবাস ব'লে।
আলোতে সোনা, আকাশে নীলা,
সেথা যে চির-জানারি লীলা,
মায়ের ভাষা শোনে সেখানে
শ্যামল ভাষা যেখানে গাছে॥

৮ বৈশাখ, ১৩৩৪।

কুটীরবাসী

তরুবিলাসী আমাদের এক তরুণ বন্ধু এই আশ্রমের এক কোণে পথের ধারে একখানি গোলাকার কুটীর রচনা ক'রেচেন। সেটি আছে একটি পুরাতন তালগাছের চরণ বেষ্টন ক'রে। তাই তা'র নাম হ'য়েছে তালধ্বজ। এটি যেন মৌচাকের মতো, নিভৃতবাসের মধু দিয়ে ভরা। লোভনীয় ব'লেই মনে করি, সেই সঙ্গে এও মনে হয় বাসস্থান সম্বন্ধে অধিকারভেদ আছে; যেখানে আশ্রয় নেবার ইচ্ছা থাকে সেখানে হয় তো আশ্রয় নেবার যোগ্যতা থাকে না।

তোমার কুটীরের
সমুখবাটে
পল্লীরমণীরা
চ'লেছে হাটে।
উড়েছে রাঙা ধূলি, উঠেছে হাসি,—
উদাসী বিবাগীর চলার বাঁশি
আঁধারে আলোকেতে
সকাল সাঁঝে
পথের বাতাসের
বুকেতে বাজে॥

যা-কিছু আসে যায়
মাটির 'পরে
পরশ লাগে তারি
তোমার ঘরে।

ঘাসের কাঁপা লাগে, পাতার দোলা,
শরতে কাশ বনে তুফান-তোলা,
প্রভাতে মধুপের
গুন্‌-গুনানি,
নিশীথে ঝিঁঝিঁ-রবে
জাল-বুনানি ॥

দেখেছি ভোরবেলা
ফিরিছ একা,
পথের ধারে পাও
কিসের দেখা।
সহজে সুখী তুমি জানে তা কেবা,
ফুলের গাছে তব স্নেহের সেবা,
এ কথা কারো মনে
র'বে কি কালি,
মাটির 'পরে গেলে
হৃদয় ঢালি' ?

দিনের পরে দিন
যে-দান আনে
তোমার মন তা'রে
দেখিতে জানে।
নম্র তুমি, তাই সরল-চিতে
সবার কাছে কিছু পেরেছো নিতে,—

উচ্চ পানে সদা
মেলিয়া আঁখি
নিজেরে পলে পলে
দাওনি ফাঁকি ॥

চাওনি জিনে নিতে
হৃদয় কারো,
নিজের মন তাই
দিতে যে পারো।
তোমার ঘরে আসে পথিক জন,
চাহেনা জ্ঞান তা'রা, চাহেনা ধন,
এটুকু বুঝে যায়
কেমন ধারা
তোমারি আসনের
সরিক তা'রা ॥

তোমার কুটীরের
পুকুর পাড়ে
ফুলের চারাগুলি
যতনে বাড়ে।
তোমারো কথা নাই, তা'রাও বোবা,
কোমল কিশলয়ে সরল শোভা।
শ্রদ্ধা দাও, তবু
মুখ না খোলে,
সহজে বোঝা যায়
নীরব ব'লে ॥

তোমারি মতো তব
কুটীর খানি,
স্নিগ্ধ ছায়া তা'র
বলে না বাণী।
তাহার শিয়রেতে তালের গাছে
বিরল পাতা ক-টি আলোয় নাচে,
সমুখে খোলা মাঠ
করিছে ধূ ধূ,
দাঁড়ায়ে দূরে দূরে
খেজুর শুধু॥

তোমার বাসাখানি
আঁটিয়া মুঠি
চাহে না আঁকড়িতে
কালের ঝুঁটি।
দেখি যে পথিকের মতোই তাকে,
থাকা ও না-থাকার সীমায় থাকে।
ফুলের মতো ও যে,
পাতার মতো,
যখন যাবে, রেখে
যাবে না ক্ষত॥

নাইকো রেষারেষি
পথে ও ঘরে,
তাহারা মেশামেশি
সহজে করে।

কীর্ত্তিজালে ঘেরা আমি তো ভাবি—
তোমার ঘরে ছিল আমারো দাবী ;
হারায়ে ফেলেছি সে
ঘূর্ণিবায়ে,
অনেক কাজে, আর
অনেক দায়ে ॥

হাসির পাথেয়

তখন আমার অল্প বয়স। পিতা আমাকে সঙ্গে ক'রে হিমালয়ে চ'লেচেন ড্যাল্‌হৌসী পাহাড়ে। সকাল বেলায় ডাণ্ডি চ'ড়ে বেরোতুম, অপরাহ্ণে ডাক-বাংলায় বিশ্রাম হ'তো। আজো মনে আছে এক জায়গায় পথের ধারে ডাণ্ডিওয়ালারা ডাণ্ডি নামিয়েছিলো। সেখানে শ্যাওলায় শ্যামল পাথরগুলোর উপর দিয়ে গুহার ভিতর থেকে ঝর্‌না নেমে উপত্যকায় কলশব্দে ঝ'রে প'ড়্‌চে। সেই প্রথম দেখা ঝর্‌নার রহস্য আমার মনকে প্রবল ক'রে টেনেছিলো। এদিকে ডানপাশে পাহাড়ের ঢালু গায়ে স্তরে স্তরে শস্যক্ষেত হল্‌দে ফুলে ছাওয়া—দেখে দেখে তৃপ্তির শেষ হয় না—কেবলি ভাবি এইগুলো ভ্রমণের লক্ষ্য কেন না হবে, কেবল ক্ষণিক উপলক্ষ্য কেন হয়? সেই ঝর্‌না কোন্ নদীর সঙ্গে মিলে কোথায় গেছে জানিনে কিন্তু সেই মুহূর্ত্তকালের প্রথম পরিচয়টুকু কখনো ভুলবো না।

হিমালয় গিরিপথে চ'লেছিনু কবে বাল্যকালে
মনে পড়ে। ধূর্জ্জটীর তাণ্ডবের ডম্বরুর তালে
যেন গিরি পিছে গিরি উঠিছে নামিছে বারেবারে
তপোঘন অরণ্যের তল হ'তে মেঘের মাঝারে
ধরার ইঙ্গিত যেথা স্তব্ধ রহে শূন্যে অবলীন,
তুষার-নিরুদ্ধ বাণী, বর্ণহীন বর্ণনাবিহীন।

সেদিন বৈশাখমাস, খণ্ড খণ্ড শস্যক্ষেত্রস্তরে
রৌদ্রবর্ণ ফুল;—মেঘের কোমল ছায়া তারি 'পরে

যেন স্নিগ্ধ আকাশের ক্ষণে ক্ষণে নীচে নেমে এসে
ধরণীর কানে কানে প্রশংসার বাক্য ভালোবেসে।
সেইদিন দেখেছিনু নিবিড় বিস্ময়মুগ্ধ চোখে
চঞ্চল নির্ঝরধারা গুহা হ'তে বাহিরি' আলোকে
আপনাতে আপনি চকিত, যেন কবি বাল্মীকির
উচ্ছ্বসিত অনুষ্টুভ। স্বর্গে যেন সুর-সুন্দরীর
প্রথম যৌবনোল্লাস, নূপুরের প্রথম ঝঙ্কার,
আপনার পরিচয়ে নিঃসীম বিস্ময় আপনার,—
আপনারি রহস্যের পিছে পিছে উৎসুক চরণে
অশ্রান্ত সন্ধান। সেই ছবিখানি রহিল স্মরণে
চিরদিন মনোমাঝে।
সেদিনের যাত্রাপথ হ'তে
আসিয়াছি বহুদূরে; আজি ক্লান্ত জীবনের স্রোতে
নেমেছে সন্ধ্যার নীরবতা। মনে উঠিতেছে ভাসি'
শৈলশিখরের দূর নির্ম্মল শুভ্রতা রাশি রাশি
বিগলিত হ'য়ে আসে দেবতার আনন্দের মতো
প্রত্যাশী ধরণী যেথা প্রণামে ললাট অবনত।
সেই নিরন্তর হাসি অবলীল গতিচ্ছন্দে বাজে
কঠিন বাধায় কীর্ণ শঙ্কায় সঙ্কুল পথমাঝে
দুর্গমেরে করি' অবহেলা। সে-হাসি দেখেছি বসি'
শস্যভরা তটচ্ছায়ে কলস্বরে চ'লেছে উচ্ছসি'
পূর্ণবেগে। দেখেছি অম্লান তা'রে তীব্র রৌদ্রদাহে
শুষ্ক শীর্ণ দৈন্য-দিনে বহি' যায় অক্লান্ত প্রবাহে
সৈকতিনী, রক্তচক্ষু বৈশাখেরে নিঃশঙ্ক কৌতুকে
কটাক্ষিয়া—অফুরান্ হাস্যধারা মৃত্যুর সম্মুখে॥

হে হিমাদ্রি, সুগম্ভীর, কঠিন তপস্যা তব গলি'
ধরিত্রীরে করে দান যে-অমৃতবাণীর অঞ্জলি
এই সে হাসির মন্ত্র, গতিপথে নিঃশেষ পাথেয়
নিঃসীম সাহস বেগ, উল্লসিত অশ্রান্ত অজেয় ॥

শান্তিনিকেতন
১লা বৈশাখ, ১৩৩৪

নটরাজ

ঋতুরঙ্গ-শালা

ভূমিকা

নৃত্য গীত ও আবৃত্তি যোগে "নটরাজ" দোল পূর্ণিমার রাত্রে শান্তি-নিকেতনে অভিনীত হ'য়েছিলো।

নটরাজের তাণ্ডবে তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্ত্তিত হ'য়ে প্রকাশ পায়, তাঁর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশের রসলোক উন্মথিত হ'তে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। "নটরাজ" পালা-গানের এই মর্ম্ম।

শান্তিনিকেতন,
দোলপূর্ণিমা, ১৩৩৪

মুক্তি-তত্ত্ব

মুক্তি-তত্ত্ব শুন্‌তে ফিরিস্‌
তত্ত্ব-শিরোমণির পিছে ?
হায়রে মিছে, হায়রে মিছে !

মুক্ত যিনি দেখ্‌ না তাঁরে,
আয় চ'লে তাঁর আপন দ্বারে,
তাঁর বাণী কি শুক্‌নো পাতায়
হল্‌দে রঙে লেখেন তিনি ?

মরা ডালের ঝরা ফুলের
সাধন কি তাঁর মুক্তি-কূলের ?
মুক্তি কি পণ্ডিতের হাটে
উক্তি-রাশির বিকি-কিনি ?

এই নেমেছে চাঁদের হাসি
এই খানে আয় মিল্‌বি আসি',
বীণার তারে তারণ-মন্ত্র
শিখে নে তোর কবির কাছে।

আমি নটরাজের চেলা,
চিত্তাকাশে দেখ্‌চি খেলা,
বাঁধন-খোলার শিখ্‌চি সাধন
মহাকালের বিপুল নাচে।

দেখ্‌চি, ও যার অসীম বিত্ত
সুন্দর তা'র ত্যাগের নৃত্য,
আপ্‌নাকে তা'র হারিয়ে প্রকাশ
আপ্‌নাতে যার আপ্‌নি আছে।

যে-নটরাজ নাচের খেলায়
ভিতরকে তা'র বাইরে ফেলায়,
কবির বাণী অবাক্‌ মানি'
তারি নাচের প্রসাদ যাচে।

শুন্‌বি রে আয়, কবির কাছে
তরুর মুক্তি ফুলের নাচে,
নদীর মুক্তি আত্মহারা
নৃত্যধারার তালে তালে।

রবির মুক্তি দেখ্‌ না চেয়ে
আলোক-জাগার নাচন গেয়ে,
তারার নৃত্যে শূন্য গগন
মুক্তি যে পায় কালে কালে।

প্রাণের মুক্তি মৃত্যুরথে
নূতন প্রাণের যাত্রা-পথে,
জ্ঞানের মুক্তি সত্য-সূতার
নিত্য-বোনা চিন্তাজালে।

আয় তবে আয় কবির সাথে
মুক্তি-দোলের শুক্লরাতে,
জ্বল্‌লো আলো, বাজ্‌লো মৃদঙ্
নটরাজের নাট্যশালে ॥

উদ্বোধন

মন্দিরার মন্দ্র তব বক্ষে আজি বাজে, নটরাজ,
নৃত্যমদে মত্ত করে, ভাঙে চিন্তা, ভাঙে শঙ্কা লাজ,
তুচ্ছ করে সম্মানের অভিমান, চিত্ত টেনে আনে
বিশ্বের প্রাঙ্গণতলে তব নৃত্যচ্ছন্দের সন্ধানে।

মুক্তির প্রয়াসী আমি, শাস্ত্রের জটিল তর্কজালে
যৌবন হ'য়েছে বন্দী বাক্যের দুর্গের অন্তরালে ;
স্বচ্ছ আলোকের পথ রুদ্ধ করি' ক্ষুব্ধ শুষ্ক ধূলি
আবর্ত্তিয়া উঠে প্রাণে অন্ধতার জয়ধ্বজা তুলি'
চতুর্দ্দিকে। নটরাজ, তুমি আজ করো গো উদ্ধার
দুঃসাহসী যৌবনেরে, পদে পদে পড়ুক্ তোমার
চঞ্চল চরণ ভঙ্গী, রঙ্গেশ্বর, সকল বন্ধনে
উত্তাল নৃত্যের বেগে,—যে-নৃত্যের অশান্ত স্পন্দনে
ধূলিবন্দিশালা হ'তে মুক্তি পায় নব-শষ্পদল ;
পুলকে কম্পিত হয় প্রাণের দুরন্ত কৌতূহল,
আপনারে সন্ধানিতে ছুটে যায় দূর কালপানে,
দুর্গম দেশের পথে, জন্ম-মরণের তালে তানে,
সৃষ্টির রহস্যদ্বারে নৃত্যের আঘাত নিত্য হানে ;
যে-নৃত্যের আন্দোলনে মরুর পঞ্জরে কম্প আনে,
ক্ষুব্ধ হয় শুষ্কতার সজ্জাহীন লজ্জাহীন শাদা,
উচ্ছিন্ন করিতে চায় জড়ত্বের রুদ্ধ-বাক্ বাধা,

বন্ধ্যতার অন্ধ দুঃশাসন ; শ্যামলের সাধনাতে
দীক্ষা ভিক্ষা করে মরু তব পায়ে ; যে-নৃত্য আঘাতে
বহ্নিবাষ্প-সরোবরে উর্ম্মি জাগে প্রচণ্ড চঞ্চল,
অতল আবর্ত্তবক্ষে গ্রহ-নক্ষত্রের শতদল
প্রস্ফুটিয়া স্ফুরে নিত্যকাল ; ধূমকেতু অকস্মাৎ
উড়ায় উত্তরী হাস্যবেগে, করে ক্ষিপ্র পদ-পাত
তোমার ডম্বরুতালে, পূজা-নৃত্য করি' দেয় সারা
সূর্য্যের মন্দির-সিংহদ্বারে, চ'লে যায় লক্ষ্যহারা
গৃহশূন্য পান্থ উদাসীন।

নটরাজ, আমি তব
কবি-শিষ্য, নাটের অঙ্গনে তব মুক্তি-মন্ত্র লবো।
তোমার তাণ্ডব-তালে কর্ম্মের বন্ধন-গ্রন্থগুলি
ছন্দবেগে স্পন্দমান পাকে পাকে সদ্য যাবে খুলি' ;
সর্ব্ব অমঙ্গল-সর্প হীনদর্প অবনম্র ফণা
আন্দোলিবে শান্ত-লয়ে।

প্রভু, এই আমার বন্দনা
নৃত্যগানে অর্পিব চরণতলে, তুমি মোর গুরু,
আজিকে আনন্দে ভয়ে বক্ষ মোর করে দুরু দুরু।
পূর্ণচন্দ্রে লিপি তব, হে পূর্ণ, পাঠালে নিমন্ত্রণে
বসন্তদোলের নৃত্যে, দক্ষিণ-বায়ুর আলিঙ্গনে,
মল্লিকার গন্ধোল্লাসে, কিংশুকের দীপ্ত রক্তাংশুকে,
বকুলের মত্ততায়, অশোকের দোদুল কৌতুকে,
বেণুবনবীথিকার নিরন্তর মর্ম্মরে কম্পনে
ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে, আম্রমঞ্জরীর সর্ব্বত্যাগপণে,
পলাশের গরিমায়। অবসাদে যেন অন্যমনে

তাল ভঙ্গ নাহি করি, তব নামে আমার আহ্বান
জড়ের স্তব্ধতা ভেদি' উৎসারিত ক'রে দিক্ গান !
আমার আহ্বান যেন অভ্রভেদী তব জটা হ'তে
উত্তারি' আনিতে পারে নির্ঝরিত রস-সুধা স্রোতে
ধরিত্রীর তপ্ত বক্ষে নৃত্যচ্ছন্দ-মন্দাকিনী ধারা,
ভস্ম যেন অগ্নি হয়, প্রাণ যেন পায় প্রাণ-হারা ॥

নৃত্য

গান

নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ,
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও
মুক্ত সুরের ছন্দ হে॥
তোমার চরণ-পবন-পরশে
সরস্বতীর মানস সরসে
যুগে যুগে কালে কালে,
সুরে সুরে তালে তালে,
ঢেউ তুলে দাও মাতিয়ে জাগাও
অমল কমল গন্ধ হে॥

নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক্ চিত্ত মম।

নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ,
নৃত্যে তোমার মায়া।
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে
কাঁপে নৃত্যের ছায়া।
তোমার বিশ্ব-নাচের দোলায়
বাঁধন পরায়, বাঁধন খোলায়,

যুগে যুগে কালে কালে,
সুরে সুরে তালে তালে ;
অন্ত কে তা'র সন্ধান পায়
ভাবিতে লাগায় ধন্দ হে ॥

নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক্ চিত্ত মম।

নৃত্যের বশে সুন্দর হ'লো
বিদ্রোহী পরমাণু ;
পদযুগ ঘিরে জ্যোতি-মঞ্জীরে
বাজিল চন্দ্র ভানু।
{তব নৃত্যের প্রাণ-বেদনায়
বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়,
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে,
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময়
তোমার পরমানন্দ হে ॥}

নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক্ চিত্ত মম।

মোর সংসারে তাণ্ডব তব,
কম্পিত জটাজালে।
লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার
নাচের ঘূর্ণি তালে।
ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর,
ওগো শঙ্কর, হে ভয়ঙ্কর,
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে,
জীবন-মরণ নাচের ডমরু
বাজাও জলদ-মন্দ্র হে॥

নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক্ চিত্ত মম।

ঋতু-নৃত্য

বৈশাখ

ধ্যান-নিমগ্ন নীরব নগ্ন
নিশ্চল তব চিত্ত ;
নিঃস্ব গগনে বিশ্ব ভুবনে
নিঃশেষ সব বিত্ত।

রসহীন তরু, নির্জ্জীব মরু,
পবনে গর্জ্জে রুদ্র ডমরু,
ঐ চারিধার করে হাহাকার
ধরা-ভাণ্ডার রিক্ত॥

তব তপ-তাপে হের' সবে কাঁপে,
দেব-লোক হ'লো ক্লান্ত।
ইন্দ্রের মেঘ, নাহি তা'র বেগ,
বরুণ করুণ শান্ত।

দুর্দ্দিনে আনে নির্দ্দয় বায়ু,
সংহার করে কাননের আয়ু,
ভয় হয় দেখি, নিখিল হবে কি
জড়দানবের ভৃত্য॥

জাগো ফুলে ফলে নব তৃণদলে
তাপস, লোচন মেলো হে।
জাগো মানবের আশায় ভাষায়,
নাচের চরণ ফেলো হে।

জাগো ধনে ধানে, জাগো গানে গানে,
জাগো সংগ্রামে, জাগো সন্ধানে,
আশ্বাস-হারা উদাস পরাণে
জাগাও উদার নৃত্য॥

ভুলেছে ছন্দ, ভালোয় মন্দ
একাকার তাই হায় রে।
কদর্য্য তাই করিছে বড়াই,
ধরণী লজ্জা পায় রে।

পিনাকে তোমার দাও টঙ্কার,
ভীষণে মধুরে দিক্ ঝঙ্কার,
ধুলায় মিশাক্ যা কিছু ধুলার,
জয়ী হোক্ যাহা নিত্য॥

বৈশাখ-আবাহন

গান

এসো, এসো, এসো, হে বৈশাখ!
তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জ্জনা দূর হ'য়ে যাক্।
যাক্ পুরাতন স্মৃতি, যাক্ ভুলে যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক্।
মুছে যাক্ সব গ্লানি, ঘুচে যাক্ জরা,
অগ্নিস্নানে দেহে প্রাণে শুচি হোক্ ধরা।
রসের আবেশ রাশি শুষ্ক করি' দাও আসি',
আনো, আনো, আনো তব প্রলয়ের শাঁখ,
মায়ার কুজ্‌ঝটি-জাল যাক্ দূরে যাক্॥

বৈশাখের প্রবেশ

নমো, নমো, হে বৈরাগী!
তপোবহ্নির শিখা জ্বালো জ্বালো,
নির্ব্বাণহীন নির্ম্মল আলো
অন্তরে থাক্ জাগি'।
নমো নমো হে বৈরাগী॥

সম্বোধন

ধূসর বসন, হে বৈশাখ,
রক্ত লোচন, হে নির্ব্বাক্,
শুষ্কপথের দানব দস্যু,
শুষে নিতে চাও হাসি ও অশ্রু,
ইঙ্গিতে দাও দারুণ ডাক।
স্তম্ভিত হ'লো সে ডাকে পৃথ্বি,
ভাণ্ডারে তা'র কাঁপিল ভিত্তি,
শঙ্কায় তা'র শুকায় তালু,
অট্ট হাসিল মরুর বালু।
হুঙ্কার সেই তপ্ত হাওয়ায়
প্রান্তর হ'তে প্রান্তরে ধায়,
দিগ্বধূদের নীরবে কাঁদায়,
শূন্যে শূন্যে উড়ায় ধূলি,
বিজয়পতাকা আকাশে তুলি'।
দুহিয়া ল'য়েছো গগন ধেনুরে,
ঝরায়ে দিয়েছো শিরীষ রেণুরে,
উদাস ক'রেছো রাখাল-বেণুরে
তৃষ্ণাকরুণ সারঙ্ তানে।
শীর্ণ নদীর গেল সঞ্চয়,
ঝিরিঝিরি জল ধীরি ধীরি বয়,
আকুলিয়া উঠে কাননের ভয়
ভীরু কপোতের কাকলি গানে।

ধূসর বসন, হে বৈশাখ,
রক্তলোচন, হে নির্ব্বাক্,
শুষ্ক পথের দানব দস্যু,
শুষে নিতে চাও হাসি ও অশ্রু,
ইঙ্গিতে দাও দারুণ ডাক ॥

গান

হৃদয় আমার, ঐ বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে,
বেড়া-ভাঙার মাতন নামে উদ্দাম উল্লাসে।
মোহন এলো ভীষণ বেশে
আকাশ-ঢাকা জটিল কেশে,
এলো তোমার সাধন-ধন চরম সর্ব্বনাশে ॥
বাতাসে তোর সুর ছিল না, ছিল তাপে ভরা।
পিপাসাতে বুক-ফাটা তোর শুষ্ক কঠিন ধরা।
জাগ্‌বে হতাশ, আয়রে ছুটে'
অবসাদের বাঁধন টুটে',
এলো তোমার পথের সাথী বিপুল অট্টহাসে ॥

কাল বৈশাখী

ডাকো বৈশাখ, কাল-বৈশাখী,
করো তা'রে লীলা-সঙ্গিনী,—
কেন সন্ন্যাসী র'য়েছো একাকী
আসুক্ প্রলয়-রঙ্গিনী।

হৃত-নিঃশ্বাস অম্বর তলে
রুদ্ধ বাতাস তাপ-শৃঙ্খলে,
ঘন ঝঞ্ঝার দিক্ ঝঙ্কার
অন্তর তব চঞ্চলি',
মন্থি' আনুক্ মর্ত্ত্যস্বর্গ
তোমার অর্ঘ্য অঞ্জলি॥

বাজায় ডমরু তব তাণ্ডবে
গুরু গুরু মেঘ-মন্দ্রিয়া,—
দিগ্বধূ যত হাহাকার রবে
দুর্দ্দাম উঠে ক্রন্দিয়া।
গৈরিক তব জয় পতাকায়
সন্ধ্যা-রবির রং সে মাখায়,
কুঞ্জে বাজায় শাখায় শাখায়
তাল তমালের খঞ্জনী।
সপ্ততারার লুপ্তির 'পরে
নাচে সে সুপ্তি-ভঞ্জনী॥

তপোভঙ্গের দিবে মন্ত্রণা
তব শান্তিরে তজ্জিয়া,
তন্ত্র পরাবে রুদ্রবীণায়
রেখেছিলে যারে বর্জ্জিয়া।

দিগন্তরের সঞ্চয় টুটি'
অঞ্চলে মেঘ আনিবে সে লুটি'—
বাজিয়া উঠিবে কল-কল্লোল
বন-পল্লবে পল্লবে,—
শ্যাম উত্তরী নির্ম্মল করি'
সাজাবে আপন বল্লভে ॥

মাধুরীর ধ্যান

গান

মধ্যদিনে যবে গান
বন্ধ করে পাখী,
হে রাখাল, বেণু তব
বাজাও একাকী।

শান্ত প্রান্তরের কোণে
রুদ্র বসি' তাই শোনে,
মধুরের ধ্যানাবেশে
স্বপ্নমগ্ন আঁখি;
হে রাখাল, বেণু যবে
বাজাও একাকী॥

সহসা উচ্ছ্বসি' উঠে
ভরিয়া আকাশ
তৃষাতপ্ত বিরহের
নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস।

অম্বর প্রান্তের দূরে
ডম্বরু গম্ভীর সুরে

জাগায় বিদ্যুৎ ছন্দে
আসন্ন বৈশাখী।
হে রাখাল, বেণু তব
বাজাও একাকী॥

পরাণে কার ধেয়ান আছে জাগি,
জানি হে জানি, কঠোর বৈরাগী।
সুদূর পথে চরণ ছুটি বাজে
পূরব কূলে বকুলবীথি মাঝে,
লুটায়ে-পড়া অমল-নীল সাজে
নব কেতকী-কেশর আছে লাগি'।
তাহারি ধ্যান পরাণে তব জাগি'॥

রাখাল বেণু বাজায় তরুতলে
রাগিণী তা'র তাহারি কথা বলে।
ভূতলে খসি' পড়িছে পাতাগুলি
চলিতে পাছে চরণে লাগে ধূলি,—
কৃষ্ণচূড়া র'য়েছে খেলা ভুলি'
পথে তাহারে ছায়া দিবারি লাগি।
তাহারি ধ্যান পরাণে আছে জাগি'।

কাঁকন-ধ্বনি তপোবনের পারে
চপল বায়ে আসিছে বারে বারে,
কপোত ছুটি তাহারি সাড়া পেয়ে

চাঁপার ডালে উঠিছে গেয়ে গেয়ে,
মরমে তব মৌনী আছে চেয়ে
আপন মাঝে তাহারি বাণী মাগি'।
তাহারি ধ্যান পরাণে আছে জাগি' ॥

কঠোর, তুমি মাধুরী-সাধনাতে
মগন হ'য়ে র'য়েছো দিনে রাতে।
নীরস কাঠে আগুন তুমি জ্বালো,
আঁধার যাহা করিবে তা'রে আলো,
অশুচি যাহা, যা-কিছু আছে কালো
দহিবে তা'রে, সুদূরে যাবে ভাগি',—
মাধুরী-ধ্যান পরাণে তব জাগি' ॥

ব্যঞ্জনা

《শুনিতে কি পাস্
এই যে শ্বসিছে রুদ্র শূন্যে শূন্যে সন্তপ্ত নিঃশ্বাস
এরি মাঝে দূরে বাজে চঞ্চলের চকিত খঞ্জনী,
মাধুরীর মঞ্জীরের মৃদুমন্দ গুঞ্জরিত ধ্বনি ?》
রৌদ্র-দগ্ধ তপস্যার মৌনস্তব্ধ অলক্ষ্য আড়ালে
স্বপ্নে-রচা অর্চ্চনার থালে
অর্ঘ্য-মাল্য সাঙ্গ হয় সঙ্গোপনে সুন্দরের লাগি।
মগ্ন যেথা ধেয়ানের সর্ব্বশূন্য গহনে বৈরাগী,
সেথা কে বুভুক্ষু আসে ভিক্ষা-অন্বেষণে ;
জীর্ণ পর্ণ-শয্যাপরে একা রহে জাগি'
কঠিনের শুষ্ক প্রাণে কোমলের পদস্পর্শ মাগি' ॥
তাপিত আকাশে
হঠাৎ নীরবে চ'লে আসে
একটি করুণ ক্ষীণ স্নিগ্ধ বায়ুধারা,
কে অভিসারিণী যেন পথে এসে পায় না কিনারা।

অকস্মাৎ কোমলের কমলমালার স্পর্শ লেগে
শান্তের চিত্তের প্রান্ত অহেতু উদ্বেগে
ভ্রূকুটিয়া ওঠে কালো মেঘে ;
বিদ্যুৎ বিচ্ছুরি' উঠে দিগন্তের ভালে,
রোমাঞ্চ-কম্পন লাগে অশ্বত্থের ত্রস্ত ডালে ডালে ;

মুহূর্ত্তে অম্বর-বক্ষে উলঙ্গিনী শ্যামা
বাজায় বৈশাখী-সন্ধ্যা-ঝঞ্ঝার দামামা,
দিগ্বিদিকে নৃত্য করে দুর্ব্বার ক্রন্দন,
ছিন্ন ছিন্ন হ'য়ে যায় ঔদাসীন্য কঠোর বন্ধন ॥

বর্ষার প্রবেশ

নমো, নমো করুণাঘন নম হে।
নয়ন স্নিগ্ধ অমৃতাঞ্জন পরশে,
জীবন পূর্ণ সুধারস বরষে,
তব দর্শন-ধন-সার্থক মন হে,
অকৃপণবর্ষণ করুণাঘন হে ॥

প্রত্যাশা

গান

তপের তাপের বাঁধন কাটুক্
রসের বর্ষণে,
হৃদয় আমার, শ্যামল-বঁধুর
করুণ স্পর্শনে ॥

ঐ কি এলে আকাশ-পারে
দিক্-ললনার প্রিয়,
চিত্তে আমার লাগ্‌লো তোমার
ছায়ার উত্তরীয়।

অঝোর-ঝরণ শ্রাবণ জলে,
তিমির-মেদুর বনাঞ্চলে
ফুটুক্ সোনার কদম্ব ফুল
নিবিড় হর্ষণে ॥

মেঘের মাঝে মৃদঙ্ তোমার
বাজিয়ে দিলে কিও
ঐ তালেতেই মাতিয়ে আমায়
নাচিয়ে দিয়ো দিয়ো।

ভরুক্ গগন, ভরুক্ কানন
ভরুক্ নিখিল ধরা,
দেখুক্ ভুবন মিলন-স্বপন
মধুর বেদনা-ভরা।

পরাণ-ভরানো ঘন ছায়াজাল
বাহির আকাশে করুক্ আড়াল,
নয়ন ভুলুক্ বিজুলি ঝলুক্
পরম দর্শনে॥

আষাঢ়

কোন্ বারতার করিল প্রচার
দূর আকাশের ইঙ্গিতে
ঐরাবতের বৃংহিতে।
নিষ্ঠুর তপে আছে নিমগ্ন
ধরণী তপস্বিনী,
রুক্ষ অঙ্গ পাংশু-ধূসর,
ধ্যান-অঙ্গন শুষ্ক ঊষর,
নাহি সখী সঙ্গিনী ;—
বুঝি আসন্ন হ'লো তা'র বর,
শুনি গর্জ্জন রথ-ঘর্ঘর,
বুঝি আসে কাঙ্ক্ষিত,
তাই চিত্ত-যে হ'লো চঞ্চল,
আঁখি-পল্লব বাষ্প-সজল,
তাই সে রোমাঞ্চিত।
ওগো বিরহিণী গেল দুর্দ্দিন
দুঃখ ঘুচিবে নিঃশেষে,
মনোমাঝে যারে রুদ্ধ নয়নে
পূজিলে ধ্যানের পুষ্প চয়নে,
দেখা দিবে আজি বিশ্বে সে !
ঐ বুঝি আসে আকাশে আকাশে
সমারোহ তা'র বিস্তারি',

বিজয়ী সে বীর, ওরে ভয়ভীতা
যাবে তোর ভয়, ওরে পিপাসিতা
তৃষা হ'তে দিবে নিস্তারি'।
ললাটে নিপুণ পত্রলেখাটি
আঁকো কুঙ্কুম চন্দনে।
দুলাও চামেলি অলকে তোমার
কবরী রচিয়া এলো-কেশভার
বেঁধে তোলো বেণী-বন্ধনে॥

উঠ ধূলি হ'তে ওগো দুঃখিনী
ছাড়ো গৈরিক উত্তরী।
নীলবসনের অঞ্চলখানি
কম্পিত বুকে লহ লহ টানি'
হাসিমুখে চাহ সুন্দরী।
বীর-মঙ্গল ঘোষুক মন্দ্র
মুখে তুলে তোর শঙ্খ নে।
কৌতুক সুখ চক্ষে ফুটুক্,
বিদ্যুৎ-শিখা কম্পি' উঠুক্
তব চঞ্চল কঙ্কণে॥

কুঞ্জকানন জাগ্রত হোক্
আজি বন্দনা সঙ্গীতে—
শিহর লাগুক্ শাখায় শাখায়,
মাতন লাগুক্ শিখীর পাখায়
তব নৃত্যের ভঙ্গীতে।

শ্যাম বন্ধুরে শ্যামল তৃণের
আসনে বসাবি অঙ্গনে।
রাখিবি দুয়ারে আল্পনা আঁকি’,
চরণের তলে ধূলা দিবি ঢাকি’,
টগর করবী রঙ্গনে।

গাও জয় জয়, গাও জয়গান
ঢেউ তোলো স্বরসপ্তকে,
বনপথে আসে মনোরঞ্জন,
নয়নে পরাবে প্রেম-অঞ্জন,
সুধা দিবে চিরতপ্তকে।

লীলা

গান

গগনে গগনে আপনার মনে
কী খেলা তব।
তুমি কত বেশে নিমেষে নিমেষে
নিতুই নব॥

জটার গভীরে লুকালে রবিরে
ছায়াপটে আঁকো এ কোন্ ছবিরে!
মেঘমল্লারে কী বলো আমারে
কেমনে কবো॥

বৈশাখী ঝড়ে সেদিনের সেই
অট্টহাসি
গুরু গুরু সুরে কোন্ দূরে দূরে
যায়-যে ভাসি'।

সে সোনার আলো শ্যামলে মিশালো,
শ্বেত উত্তরী আজ কেন কালো?
লুকালে ছায়ায় মেঘের মায়ায়
কী বৈভব॥

বর্ষা-মঙ্গল

ওগো সন্ন্যাসী, কী গান ঘনালো মনে !
গুরু গুরু গুরু নাচের ডমরু
বাজিল ক্ষণে ক্ষণে ॥

তোমার ললাটে জটিল জটার ভার
নেমে নেমে আজি পড়িছে বারম্বার,
বাদল আঁধার মাতালো তোমার হিয়া,
বাঁকা বিদ্যুৎ চোখে উঠে চমকিয়া।

চির-জনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া
আজি এ বিরহ-দীপন-দীপিকা
পাঠালো তোমারে এ কোন্ লিপিকা,
লিখিল নিখিল-আঁখির কাজল দিয়া,
চির-জনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া ॥

মনে পড়িল কি ঘন কালো এলোচুলে
অগুরু ধূপের গন্ধ ?
শিখি-পুচ্ছের পাখা সাথে দুলে' দুলে'
কাঁকন-দোলন ছন্দ ?

মনে পড়িল কি নীল নদীজলে
ঘন শ্রাবণের ছায়া ছলছলে,
মিলি মিলি সেই জল-কলকলে
কলালাপ মৃদুমন্দ ;

স্খলিত-পায়ের চলা দ্বিধাহত,
ভীরু নয়নের পল্লব নত,
না-বলা কথার আভাসের মতো
নীলাম্বরের প্রান্ত ?

মনে পড়িছে কি কাঁখে তুলে' ঝারি'
তরু তলে তলে ঢেলে চলে বারি,
সেচন-শিথিল বাহু দুটি তারি
ব্যথায় আলসে ক্লান্ত ?

ওগো সন্ন্যাসী, পথ যায় ভাসি'
ঝর ঝর ধারাজলে—
তমাল বনের শ্যামল তিমির তলে।
দ্যুলোক ভূলোকে দূরে দূরে বলাবলি
চির-বিরহের কথা,
বিরহিণী তা'র নত আঁখি ছলছলি'
নীপ-অঞ্জলি রচে বসি' গৃহকোণে,
ঢেলে ঢেলে দেয় তোমারে স্মরিয়া মনে,
ঢেলে দেয় ব্যাকুলতা।

কভু বাতায়নে অকারণে বেলা বাহি'
আতুর নয়নে ছু-হাতে আঁচল ঝাঁপে।
তুমি চিত্তের অন্তরে অবগাহি'
খুঁজিয়া দেখিছ ধৈরজ নাহি নাহি,
মল্লার রাগে গর্জ্জিয়া ওঠো গাহি',
বক্ষে তোমার অক্ষের মালা কাঁপে।

যাক্ যাক্ তব মন গ'লে গ'লে যাক্,
গান ভেসে গিয়ে দূরে চ'লে চ'লে যাক্,
বেদনার ধারা তুর্দ্দাম দিশাহারা
দুখ-দুর্দ্দিনে দুই কূল তা'র ছাপে।

কদম্ববন চঞ্চল ওঠে দুলি',
সেই মতো তব কম্পিত বাহু তুলি'
টলমল নাচে নাচো সংসার ভুলি',
আজ, সন্ন্যাসী, কাজ নাই জপে জাপে॥

শ্রাবণ-বিদায়

গান

শ্রাবণ তুমি বাতাসে কা'র
আভাস পেলে ?
পথে তারি সকল বারি
দিলে ঢেলে।
কেয়া কাঁদে, যায় যায় যায়।
কদম ঝরে, হায় হায় হায়।
পূব হাওয়া কয় "ওর তো সময় নাই বাকি আর",
শরৎ বলে, "যাক্ না সময় ভয় কিবা তা'র,—
কাটবে বেলা আকাশমাঝে বিনা কাজে
অসময়ের খেলা খেলে" ॥

কালো মেঘের আর কি আছে দিন
ও-যে হ'লো সাথীহীন।

পূব হাওয়া কয়, কালোর এবার যাওয়াই ভালো,
শরৎ বলে, গেঁথে দেবো কালোয় আলো,
সাজ্‌বে বাদল আকাশ মাঝে
সোনার সাজে
কালিমা ওর মুছে ফেলে ॥

যায়রে শ্রাবণ-কবি রস-বর্ষা ক্ষান্ত করি' তা'র,
কদম্বের রেণুপুঞ্জে পদে পদে কুঞ্জবীথিকার
ছায়াঞ্চল ভরি' দিল। জানি, রেখে গেল তা'র দান
বনের মর্ম্মের মাঝে ; দিয়ে গেল অভিষেকস্নান
সুপ্রসন্ন আলোকেরে ; মহেন্দ্রের অদৃশ্য বেদীতে
ভরি' গেল অর্ঘ্যপাত্র বেদনার উৎসর্গ-অমৃতে ;
সলিল-গণ্ডূষ দিতে তটিনী সাগর-তীর্থে চলে,
অঞ্জলি ভরিল তারি ; ধরার নিগূঢ় বক্ষতলে
রেখে গেল তৃষ্ণার সম্বল ; অগ্নিতীক্ষ্ণ বজ্রবাণ
দিগন্তের তূণ ভরি' একান্তে করিয়া গেল দান
কাল-বৈশাখীর তরে ; নিজ হস্তে সর্ব্ব ম্লানতার
চিহ্ন মুছে দিয়ে গেল। আজ শুধু রহিল তাহার
রিক্তবৃষ্টি জ্যোতিঃশুভ্র মেঘে মেঘে মুক্তির লিখন,
আপন পূর্ণতাখানি নিখিলে করিল সমর্পণ॥

শেষ মিনতি

গান

কেন পান্থ এ চঞ্চলতা ?
কোন্ শূন্য হ'তে এলো কার বারতা।

যাত্রা বেলায় রুদ্র রবে
বন্ধন-ডোর ছিন্ন হবে,
ছিন্ন হবে, ছিন্ন হবে।

নয়ন কিসের প্রতীক্ষা-রত
বিদায় বিষাদে উদাস মতো,
ঘন-কুন্তলভার ললাটে নত
ক্লান্ত তড়িৎবধূ তন্দ্রাগতা॥

মুক্ত আমি, রুদ্ধ দ্বারে
বন্দী করে কে আমারে।
যাই চ'লে যাই অন্ধকারে
ঘণ্টা বাজায় সন্ধ্যা যবে।

কেশর-কীর্ণ কদম্ব বনে
মর্ম্মর মুখরিল মৃদু-পবনে,
বর্ষণ-হর্ষভরা ধরণীর
বিরহ-বিশঙ্কিত করুণ কথা।
ধৈর্য্য মানো ওগো ধৈর্য্য মানো,
বর-মাল্য গলে তব হয়নি ম্লান,
আজো হয়নি ম্লান,

ফুল-গন্ধ-নিবেদন-বেদন সুন্দর
মালতী তব চরণে প্রণতা ॥

শ্রাবণ সে যায় চ'লে পান্থ,
কৃশতনু ক্লান্ত,
উড়ে পড়ে উত্তরী-প্রান্ত
উত্তর পবনে।
যূথীগুলি সকরুণ গন্ধে
আজি তা'রে বন্দে,
নীপ-বন মর্ম্মর ছন্দে
জাগে তা'র স্তবনে।
শ্যামঘন তমালের কুঞ্জে
পল্লব পুঞ্জে
আজি শেষ মল্লারে গুঞ্জে
বিচ্ছেদ গীতিকা,
আজি মেঘ বর্ষণ-রিক্ত
নিঃশেষ বিত্ত,
দিল করি' শেষ অভিষিক্ত
কিংশুক বীথিকা।

শরৎ

ধ্বনিল গগনে আকাশ-বাণীর বীণ্,
　　শিশির-বাতাসে দূরে দূরে ডাক দিল কে ?
আয় স্কুলগনে, আজ পথিকের দিন,
　　এঁকে নে ললাট জয়-যাত্রার তিলকে।

গেল খুলি গেল মেঘের ছায়ার দ্বার,
দিকে দিকে ঘোচে কালো আবরণ-ভার,
তরুণ আলোক মুকুট প'রেছে তা'র,
　বিজয়-শঙ্খ বেজে ওঠে তাই ত্রিলোকে ॥

শরৎ এনেছে অপরূপ রূপ-কথা।
　　নিত্যকালের বালক-বীরের মানসে।
নবীন রক্তে জাগায় চঞ্চলতা,
　　বলে, "চলো চলো, অশ্ব তোমার আনো' সে।

ধেয়ে যেতে হবে দুস্তর প্রান্তরে,
বন্দিনী কোন্ রাজকন্যার তরে,
মায়াজাল ভেদি' চলো সে রুদ্ধ ঘরে,
　লও কার্ম্মুক, দানবের বুক হানো' সে ॥"

ওরে শারদার জয়মন্ত্রের গুণে
　　বীর-গৌরবে পার হ'তে হবে সাগরে।

ইন্দ্রের শর ভরি' নিতে হবে তূণে
রাক্ষসপুরী জিনে নিতে হবে, জাগো রে।

"দেবী শারদার যে-প্রসাদ শিরে লয়ি'
দেব-সেনাপতি কুমার দৈত্য-জয়ী,
সে-প্রসাদ খানি দাওগো অমৃতময়ী",
এই মহা-বর চরণে তাঁহার মাগো রে॥

আজি আশ্বিনে স্বচ্ছ বিমল প্রাতে
শুভ্রের পায়ে অম্লান মনে নম' রে।
স্বর্গের রাখী বাঁধো দক্ষিণ হাতে
আঁধারের সাথে আলোকের মহাসমরে।

মেঘ-বিমুক্ত শরতের নীলাকাশ
ভুবনে ভুবনে ঘোষিল এ আশ্বাস :—
"হবে বিলুপ্ত মলিনের নাগপাশ,
জয়ী হবে রবি, মরিবে মরিবে তম রে॥"

শান্তি

গান

পাগল আজি আগল খোলে
বিদায় রজনীতে,
চরণে ওর বাঁধিবি ডোর,
কী আশা তোর চিতে ?

গগনে তা'র মেঘ-দুয়ার ঝেঁপে,
বুকেরি ধন বুকেতে ছিল চেপে,
হিম হাওয়ায় গেল সে দ্বার কেঁপে,
এসেছে ডাক ভোরের রাগিণীতে ॥

শীতল হোক্ বিমল হোক্ প্রাণ,
হৃদয়ে শোক রাখুক্ তা'র দান।

যা ছিল ঘিরে শূন্যে সে মিলালো,
সে-ফাঁক দিয়ে আসুক্ তবে আলো,
বিজনে বসি' পূজাঞ্জলি ঢালো
শিশিরে-ভরা শিউলি-ঝরা গীতে ॥

শরতের প্রবেশ

নির্ম্মল কান্ত, নমো হে নমঃ
স্নিগ্ধ সুশান্ত নমো হে নমঃ।
বন অঙ্গনময় রবিকর-রেখা
লেপিল আলিম্পনলিপি-লেখা,
আঁকিব তাহে প্রণতি মম।
নমোহে নমঃ।

শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা
কাজ-ভোলানো সুরে,—
চপল করে হাঁসের দুটি পাখা
ওড়ায় তা'রে দূরে।
শিউলি কুঁড়ি যেমনি ফোটে শাখে
অম্‌নি তা'রে হঠাৎ ফিরে ডাকে,
পথের বাণী পাগল করে তাকে,
ধূলায় পড়ে ঝুরে।
শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা
কাজ-খোওয়ানো সুরে॥

শরৎ আজি বাজায় এ কী ছলে
পথ-ভোলানো বাঁশী।

অলস মেঘ যায়-যে দলে দলে
গগনতলে ভাসি'।
নদীর ধারা অধীর হ'য়ে চলে
কী নেশা আজি লাগালো তা'র জলে,
ধানের বনে বাতাস কী-যে বলে
বেড়ায় ঘুরে ঘুরে।
শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা,
কাজ-খোওয়ানো সুরে॥

শরৎ আজি শুভ্র আলোকেতে
মন্ত্র দিল পড়ি',
ভুবন তাই শুনিল কান পেতে
বাজে ছুটির ঘড়ি।
কাশের বনে হাসির লহরীতে
বাজিল ছুটি মর্ম্মরিত গীতে,—
ছুটির ধ্বনি আনিল মোর চিতে
পথিক বন্ধুরে।
শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা
কাজ-খোওয়ানো সুরে॥

শরতের ধ্যান

গান

আলোর অমল কমলখানি
কে ফুটালে,
নীল আকাশের ঘুম ছুটালে ॥

সেই তো তোমার পথের বঁধু
সেই তো।
দূর কুসুমের গন্ধ এনে খোঁজায় মধু—
এই তো।

আমার মনের ভাবনাগুলি
বাহির হ'লো পাখা তুলি',
ঐ কমলের পথে তাদের
সেই জুটালে ॥

সেই তো তোমার পথের বঁধু
সেই তো।
এই আলো তা'র এই তো আঁধার
এই আছে এই নেইতো।

শরৎবাণীর বীণা বাজে
কমলদলে।
ললিত রাগের সুর ঝরে তাই
শিউলি তলে।
তাইতো বাতাস বেড়ায় মেতে
কচি ধানের সবুজ ক্ষেতে,
বনের প্রাণে মর্‌মরানির
ঢেউ উঠালে ॥

শরতের বিদায়

১

কেন গো যাবার বেলা
গোপনে চরণ ফেলা,
যাওয়ার ছায়াটি পড়ে-যে হৃদয় মাঝে,
অজানা ব্যথার তপ্ত আভাস রক্ত আকাশে বাজে।
সুদূর বিরহতাপে
বাতাসে কী যেন কাঁপে,
পাখীর কণ্ঠ করুণ ক্লান্তি ভরা,
হারাই হারাই মনে করে তাই সংশয়-ম্লান ধরা।
জানিনে গহন বনে
শিউলি কী ধ্বনি শোনে,
আনমনে তা'র ভূষণ খসায়ে ফেলে।
মালতী আপন সব ঢেলে দেয় শেষ খেলা তা'র খেলে।
না হ'তে প্রহর শেষ
হবে কি নিরুদ্দেশ,
তোমার নয়নে এখনো র'য়েছে হাসি,
বাজায়ে সোহিনী এখনো মোহিনী বাঁশি ওঠে উচ্ছ্বাসি'।
এই তব আসা-যাওয়া
একি খেয়ালের হাওয়া,
মিলন পুলক তাতেও কি অবহেলা,
আজি এ বিরহ-ব্যথার বিষাদ এও কেবলি খেলা ?

———

২

গান

শিউলি ফুল, শিউলি ফুল,
কেমন ভুল, এমন ভুল ?
রাতের বায় কোন্ মায়ায়
আনিল হায় বন-ছায়ায়,
ভোর বেলায় বারে বারেই
ফিরিবারেই হ'লি ব্যাকুল।

কেন রে তুই উন্মনা,
নয়নে তোর হিমকণা ?
কোন্ ভাষায় চাস্ বিদায়,
গন্ধ তোর কী জানায়,
সঙ্গে হায় পলে পলেই
দলে দলেই যায় বকুল ॥

বিলাপ

গান

চরণরেখা তব যে-পথে দিলে লেখি'
চিহ্ন আজি তারি আপনি ঘুচালে কি ?
ছিল তো শেফালিকা
তোমারি লিপি-লিখা
তা'রে-যে তৃণতলে আজিকে লীন দেখি ?
কাশের শিখা যত কাঁপিছে থরথরি,
মলিন মালতী-যে পড়িছে ঝরি' ঝরি'।
তোমার যে-আলোকে
অমৃত দিত চোখে,
স্মরণ তারো কি গো মরণে যাবে ঠেকি' ?

হেমন্তের প্রবেশ

নম, নম, নম।
তুমি ক্ষুধার্ত্তজন-শরণ্য,
অমৃত-অন্ন-ভোগ-ধন্য
করো অন্তর মম।

হেমন্তেরে বিভল করে কিসে,
চলিতে পথে হারালো কেন দিশে!
যেন রে ওর আলোর স্মৃতিখানি
বিস্মৃতির বাষ্পে নিল টানি',—
কণ্ঠ তাই হারালো তা'র বাণী,
অশ্রু কাঁপে নয়ন অনিমেষে।
হেমন্তেরে বিভল করে কিসে!

ক্ষণেক তরে লও না ঘরে ডাকি',
যাত্রা ওর অনেক আছে বাকি।
শিশিরকণা লাগিবে পায়ে পায়ে,
রুক্ষ কেশ কাঁপিবে হিমবায়ে,
আঁধার-করা ঘনবনের ছায়ে
শুষ্ক পাতা র'য়েছে পথ ঢাকি'।
ক্ষণেক তরে লও না ঘরে ডাকি'।

বাসা-যে ওর সুদূর হিমাচলে,
শ্যাওলা-ঝোলা তিমির গুহাতলে।
যে-পথ বাহি' বলাকা যায় ফিরে
সৈকতিনী নদীর তীরে তীরে,
সে-পথ দিয়ে ধানের ক্ষেত ঘিরে
হিমের ভারে চলিবে পলে পলে।
যেতে-যে হবে সুদূর হিমাচলে॥

চলিতে পথে এলো আঁধার রাতি,
নিবিয়া গেল ছিল যে ওর বাতি।
অসুর দলে গগনে রচে কারা,
তাইতো শশী হ'য়েছে জ্যোতিহারা,
আকাশ ঘেরি ধরিবে যত তারা
কে যেন জেলে কুহেলি জাল পাতি'।
নিবিয়া গেল ছিল যে ওর বাতি॥

বধূরা যবে সাঁজের জ্যোতি জ্বালো
একটি দীপ উহারে দেওয়া ভালো।
দেবতা যারে বিঘ্ন দিয়ে হানে
তোমরা তা'রে বাঁচায়ো দয়া দানে,
কল্যাণী গো তোদেরি কল্যাণে
ছুটিয়া যাক্ কুস্বপন কালো,—
একটি দীপ উহারে দেওয়া ভালো॥

গান

শিউলি-ফোটা ফুরালো যেই শীতের বনে,
এলে-যে সেই শূন্যখণে ॥
তাই গোপনে সাজিয়ে ডালা
দুখের সুরে বরণমালা
গাঁথি মনে মনে
শূন্য খণে ॥
দিনের কোলাহলে
ঢাকা সে-যে রইবে হৃদয়তলে।
রাতের তারা উঠ্‌বে যবে
সুরের মালা বদল হবে
তখন তোমার সনে
মনে মনে ॥

হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা—
হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধূমল রঙে আঁকা।
সন্ধ্যাপ্রদীপ তোমার হাতে
মলিন হেরি কুয়াষাতে,
কণ্ঠে তোমার বাণী যেন করুণ বাষ্পে মাখা ॥
ধরার আঁচল ভ'রে দিলে প্রচুর সোনার ধানে।
দিগঙ্গনার অঙ্গন আজ পূর্ণ তোমার দানে।
আপন দানের আড়ালেতে
রইলে কেন আসন পেতে,
আপনাকে এই কেমন তোমার গোপন ক'রে রাখা ॥

হেমন্ত

১

হে হেমন্ত-লক্ষ্মী, তব চক্ষু কেন রুক্ষ চুলে ঢাকা,
ললাটের চন্দ্রলেখা অযত্নে এমন কেন ম্লান ?
হাতে তব সন্ধ্যাদীপ কেন গো আড়াল ক'রে আনো
কুয়াশায় ? কণ্ঠে বাণী কেন হেন অশ্রুবাষ্পে মাখা
গোধূলিতে আলোতে আঁধারে ? দূর হিমশৃঙ্গ ছাড়ি'
ওই হের রাজহংসশ্রেণী, আকাশে দিয়েছে পাড়ি
উজায়ে উত্তর বায়ুস্রোত, শীতে ক্লিষ্ট ক্লান্ত পাখা
মাগিছে আতিথ্য তব জাহ্নবীর জনশূন্য তটে
প্রচ্ছন্ন কাশের বনে। প্রান্তর-সীমায় ছায়াবটে
মৌনব্রত বউ-কথা-কও। গ্রাম-পথ আঁকা বাঁকা
বেণুতলে পান্থহীন অবলীন অকারণ ত্রাসে,
ক্বচিৎ চকিত-ধূলি অকস্মাৎ পবন-উচ্ছ্বাসে।

কেন বলো, হৈমন্তিকা, নিজেরে কুণ্ঠিত ক'রে রাখা,
মুখের গুণ্ঠন কেন হিমের ধূমলবর্ণে আঁকা॥

২

ভ'রেছো, হেমন্ত-লক্ষ্মী, ধরার অঞ্জলি পক্বধানে।
দিগঙ্গনে দিগঙ্গনা এসেছিলো ভিক্ষার সন্ধানে
শীত-রিক্ত অরণ্যের শূন্যপথে। ব'লেছিলো ডাকি',
"কোথায় গো, অন্নপূর্ণা, ক্ষুধার্ত্তেরে অন্ন দিবে না কি ?

শান্ত করো প্রাণের ক্রন্দন, চাও প্রসন্ন নয়ানে
ধরার ভাণ্ডার পানে।" শুনিয়া, লুকায়ে হাস্যখানি,
লুকায়ে দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণা দিয়েছো তুমি আনি',
ভূমিগর্ভে আপনার দাক্ষিণ্য ঢাকিলে সাবধানে।

স্বর্গলোক ম্লান করি' প্রকাশিলে ধরার বৈভব
কোন্ মায়ামন্ত্রগুণে, দরিদ্রের বাড়ালে গৌরব।

অমরার স্বর্ণ নামে ধরণীর সোনার অঘ্রাণে।
তোমার অমৃত নৃত্য, তোমার অমৃতস্নিগ্ধ হাসি
কখন্ ধূলির ঘরে সঞ্চিত করিলে রাশি রাশি,
আপনার দৈন্যচ্ছলে পূর্ণ হ'লে আপনার দানে॥

দীপালি

গান

হিমের রাতে ঐ গগনের
দীপগুলিরে
হেমন্তিকা ক'র্‌লো গোপন
আঁচল ঘিরে।

ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো—
"দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
সাজাও আলোয় ধরিত্রীরে" ॥

শূন্য এখন ফুলের বাগান,
দোয়েল কোকিল গাহে না গান,
কাশ ঝ'রে যায় নদীর তীরে।

যাক্‌ অবসাদ বিষাদ কালো,
দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
শুনাও আলোর জয়-বাণীরে ॥

দেব্‌তারা আজ আছে চেয়ে
জাগো ধরার ছেলে মেয়ে
আলোয় জাগাও যামিনীরে।

এলো আঁধার, দিন ফুরালো,
দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
জয় করো এই তামসীরে॥

শীতের উদ্বোধন

ডেকেছো আজি, এসেছি সাজি, হে মোর লীলাগুরু,
শীতের রাতে তোমার সাথে কী খেলা হবে সুরু !
ভাবিয়াছিনু খেলার দিন
গোধূলি-ছায়ে হ'লো বিলীন,
পরাণ মন হিমে মলিন
আড়াল তা'রে ঘেরি',—
এমন ক্ষণে কেন গগনে বাজিল তব ভেরী ?

উতর-বায় কারে জাগায়, কে বুঝে তা'র বাণী ?
অন্ধকারে কুঞ্জদ্বারে বেড়ায় কর হানি'।
কাঁদিয়া কয় কানন-ভূমি,
—"কী আছে মোর, কী চাহো তুমি ?
শুষ্ক শাখা যাও-যে চুমি'
কাঁপাও থরথর,
জীর্ণপাতা বিদায়গাথা গাহিছে মরমর।"—

বুঝেছি তব এ অভিনব ছলনাভরা খেলা,
তুলিছ ধ্বনি' কী আগমনী আজি যাবার বেলা !
যৌবনেরে তুষার-ডোরে
রাখিয়াছিলে অসাড় ক'রে ;—
বাহির হ'তে বাঁধিলে ওরে
কুয়াষা-ঘন জালে—
ভিতরে ওর ভাঙালে ঘোর নাচের তালে তালে।

(নৃত্যলীলা জড়ের শিলা করুক্‌ খানখান,
মৃত্যু হ'তে অবাধ স্রোতে বহিয়া যাক্‌ প্রাণ।
নৃত্য তব ছন্দে তারি
নিত্য ঢালে অমৃতবারি,
শঙ্খ কহে হুহুঙ্কারি'
বাঁধন সে তো মায়া,—
যা-কিছু ভয়, যা-কিছু ক্ষয়, সে তো ছায়ার ছায়া।)

(এসেছে শীত গাহিতে গীত বসন্তেরি জয়,—
যুগের পরে যুগান্তরে মরণ করে লয়।
তাণ্ডবের ঘূর্ণিঝড়ে
শীর্ণ যাহা ঝরিয়া পড়ে,
প্রাণের জয়-তোরণ গড়ে
আনন্দের তানে,
বসন্তের যাত্রা চলে অনন্তের পানে॥)

বাঁধনে যারে বাঁধিতে নারে, বন্দী করি' তা'রে
তোমার হাসি সমুচ্ছ্বাসি' উঠিছে বারে বারে।
অমর আলো হারাবে না-যে
ঢাকিয়া তা'রে আঁধার মাঝে,
নিশীথ-নাচে ডমরু বাজে
অরুণদ্বার খোলে—
জাগে মূরতি, পুরানো জ্যোতি নব উষার কোলে।

জাগুক্ মন, কাঁপুক্ বন, উড়ুক্ ঝরা পাতা,
উঠুক্ জয়, তোমারি জয়, তোমারি জয়গাথা।
ঋতুর দল নাচিয়া চলে
ভরিয়া ডালি ফুলে ও ফলে,
নৃত্য-লোল চরণতলে
মুক্তি পায় ধরা,—
ছন্দে মেতে যৌবনেতে রাঙিয়ে ওঠে জরা॥

আসন্ন শীত

শীতের বনে কোন্ সে কঠিন
আস্‌বে ব'লে
শিউলিগুলি ভয়ে মলিন
বনের কোলে ॥

আম্‌লকি ডাল সাজ্‌লো কাঙাল,
খসিয়ে দিল পল্লব জাল,
কাশের হাসি হাওয়ায় ভাসি'
যায়-যে চ'লে ॥

সইবে না সে পাতায় ঘাসে
পাণ্ডুরতা,
তাই তো আপন রঙ ঘুচালো
ঝুম্‌কো লতা।

উত্তর বায় জানায় শাসন,
পাত্‌লো তপের শুষ্ক আসন,
সাজ খসাবার এই লীলা কা'র
অট্টরোলে ॥

শীত

ওগো শীত, ওগো শুভ্র, হে তীব্র নির্ম্মম,
তোমার উত্তর বায়ু দুরন্ত দুর্দ্দম
অরণ্যের বক্ষ হানে। বনস্পতি যত
থর থর কম্পমান, শীর্ষ করি' নত
আদেশ-নির্ঘোষ তব মানে। "জীর্ণতার
মোহবন্ধ ছিন্ন করো" এ বাক্য তোমার
ফিরিছে প্রচার করি' জয়ডঙ্কা তব
দিকে দিকে। কুঞ্জে কুঞ্জে মৃত্যুর বিপ্লব
করিছে বিকীর্ণ শীর্ণ পর্ণ রাশি রাশি
শূন্য নগ্ন করি' শাখা, নিঃশেষে বিনাশি'
অকাল-পুষ্পের দুঃসাহস।

হে নির্ম্মল,
সংশয়-উদ্বিগ্ন-চিত্তে পূর্ণ করো বল;
মৃত্যু-অঞ্জলিতে ভরো অমৃতের ধারা,
ভীষণের স্পর্শঘাতে করো শঙ্কাহারা,
শূন্য করি' দাও মন; সর্ব্বস্বান্ত ক্ষতি
অন্তরে ধরুক্ শান্ত উদাত্ত মূরতি,
হে বৈরাগী। অতীতের আবর্জ্জনা-ভার,
সঞ্চিত লাঞ্ছনা গ্লানি শ্রান্তি ভ্রান্তি তা'র
সম্মার্জ্জন করি' দাও। বসন্তের কবি
শূন্যতার শুভ্র পত্রে পূর্ণতার ছবি

লেখে আসি', সে-শূন্য তোমারি আয়োজন,
সেই মতো মোর চিত্তে পূর্ণের আসন
মুক্ত করো রুদ্র-হস্তে; কুজ্‌ঝটিকা রাশি
রাখুক্ পুঞ্জিত করি' প্রসন্নের হাসি।
বাজুক্ তোমার শঙ্খ মোর বক্ষতলে
নিঃশঙ্ক দুর্জ্জয়। কঠোর উদগ্রবলে
দুর্ব্বলেরে করো তিরস্কার; অট্টহাসে
নিষ্ঠুর ভাগ্যেরে পরিহাসো; হিমশ্বাসে
আরাম করুক্ ধূলিসাৎ! হে নির্ম্মম,
গর্ব্বহরা, সর্ব্বনাশা, নমো নমো নমঃ॥

নৃত্য

গান

শীতের হাওয়ার লাগলো নাচন
আম্‌লকির এই ডালে ডালে।
পাতাগুলি শির্‌শিরিয়ে
ঝরিয়ে দিল তালে তালে ॥

উড়িয়ে দেবার মাতন এসে
কাঙাল তা'রে ক'র্‌লো শেষে,
তখন তাহার ফলের বাহার
রইলো না আর অন্তরালে ॥

শূন্য ক'রে ভ'রে-দেওয়া
যাহার খেলা
তারি লাগি রইনু ব'সে
সারা বেলা।

শীতের পরশ থেকে থেকে
যায় বুঝি ঐ ডেকে ডেকে,
সব খোওয়াবার সময় আমার
হবে কখন্ কোন্ সকালে ॥

শীতের প্রবেশ

গান

নম, মম, নম নম !
নির্দ্দয় অতি করুণা তোমার
বন্ধু তুমি হে নির্ম্মম,
যা-কিছু জীর্ণ করিবে দীর্ণ
দণ্ড তোমার দুর্দ্দম ॥

সর্ব্বনাশার নিঃশ্বাস বায়
লাগ্‌লো ভালে।
নাচ্‌লো চরণ শীতের হাওয়ায়
মরণ তালে।
ক'র্‌বো বরণ, আসুক কঠোর,
ঘুচুক্, অলস সুপ্তির ঘোর,
যাক্ ছিঁড়ে মোর বন্ধন ডোর
যাবার কালে ॥

ভয় যেন মোর হয় খান্ খান্
ভয়েরি ঘায়ে,
ভরে যেন প্রাণ ভেসে এসে দান
ক্ষতির বায়ে।
সংশয়ে মন না যেন দুলাই,
মিছে শুচিতায় তা'রে না ভুলাই,
নির্ম্মল হবো পথের ধূলাই
লাগিলে পায়ে ॥

শীত যদি তুমি মোরে দাও ডাক
দাঁড়ায়ে দ্বারে—
সেই নিমেষেই যাবো নির্ব্বাক
অজানা পারে।
নাই দিল আলো নিবে-যাওয়া বাতি,—
শুক্‌নো গোলাপ ঝরা যূথী জাতী
নির্জ্জন পথ হোক্ মোর সাথী
অন্ধকারে॥

জানি জানি, শীত, আমার যে-গীত
বীণায় নাচে
তা'রে হরিবার কভু কি তোমার
সাধ্য আছে!
দক্ষিণ বায়ে ক'রে যাবো দান
রবি-রশ্মিতে কাঁপিবে সে তান,
কুসুমে কুসুমে ফুটিবে সে গান
লতায় গাছে॥

যাহা-কিছু মোর তুমি, ওগো চোর,
হরিয়া ল'বে,
জেনো বারেবারে ফিরে ফিরে তা'রে
ফিরাতে হবে।
যা কিছু ধূলায় চাহিবে চুকাতে
ধূলা সে কিছুতে নারিবে লুকাতে,
নবীন করিয়া নবীনের হাতে
সঁপিবে কবে॥

স্তব

গান

হে সন্ন্যাসী,
হিমগিরি ফেলে নীচে নেমে এলে
কিসের জন্য ?
কুন্দমালতী করিছে মিনতি
হও প্রসন্ন।
যাহা কিছু ম্লান বিরস জীর্ণ
দিকে দিকে দিলে করি' বিকীর্ণ,
বিচ্ছেদ-ভারে বনচ্ছায়ারে
করে বিষণ্ণ ;
হও প্রসন্ন ॥
সাজাবে কি ডালা গাঁথিবে কি মালা
মরণ-সত্রে ?
তাই উত্তরী নিলে ভরি' ভরি'
শুকানো পত্রে ?
ধরণী-যে তব তাণ্ডবে সাথী
প্রলয়-বেদনা নিল বুকে পাতি',
রুদ্র এবারে বর-বেশে তা'রে
করো গো ধন্য ;
হও প্রসন্ন ॥

শীতের বিদায়

তুঙ্গ তোমার ধবল-শৃঙ্গ-শিরে
উদাসীন শীত, যেতে চাও বুঝি ফিরে ?
চিন্তা কি নাই সঁপিতে রাজ্যভার
নবীনের হাতে, চপল চিত্ত যার ?
হেলায় যে-জন ফেলায় সকল তা'র
অমিত দানের বেগে ?

দণ্ড তোমার তা'র হাতে বেণু হবে,
প্রতাপের দাপ মিলাবে গানের রবে,
শাসন ভুলিয়া মিলনের উৎসবে
জাগাবে, রহিবে জেগে ॥

সে-যে মুছে দিবে তোমার আঘাত চিহ্ন,
কঠোর বাঁধন করিবে ছিন্ন ছিন্ন।
এতদিন তুমি বনের মজ্জামাঝে
বন্দী রেখেছো যৌবনে কোন্ কাজে,
ছাড়া পেয়ে আজ কত অপরূপ সাজে
বাহিরিবে ফুলে দলে।

তব আসনের সম্মুখে যার বাণী
আবদ্ধ ছিল বহু কাল ভয় মানি'
কণ্ঠ তাহার বাতাসেরে দিবে হানি'
বিচিত্র কোলাহলে ॥

তোমার নিয়মে বিবর্ণ ছিল সজ্জা,
নগ্ন তরুর শাখা পেতো তাই লজ্জা।
তাহার আদেশে আজি নিখিলের বেশে
নীল পীত রাঙা নানা রঙ্ ফিরে এসে,
আকাশের আঁখি ডুবাইবে রসাবেশে
জাগাইবে মত্ততা।

সম্পদ তুমি যার যত নিলে হরি'
তা'র বহু গুণ ও-যে দিতে চায় ভরি',
পল্লবে যার ক্ষতি ঘ'টেছিলো ঝরি',
ফুল পাবে সেই লতা॥১

ক্ষয়ের দুঃখে দীক্ষা যাহারে দিলে,
সব দিকে যার বাহুল্য ঘুচাইলে,
প্রাচুর্য্যে তারি হ'লো আজি অধিকার।
দক্ষিণ বায়ু এই বলে বার বার,
বাঁধন-সিদ্ধ যে-জন তাহারি দ্বার
খুলিবে সকলখানে।

কঠিন করিয়া রচিলে পাত্রখানি
রস-ভারে তাই হবে না তাহার হানি,
লুঠি লও ধন, মনে মনে এই জানি'
দৈন্য পূরিবে দানে॥

বসন্তের প্রবেশ

নম নম নম নম
তুমি সুন্দরতম।
দূর হইল দৈন্যদ্বন্দ্ব,
ছিন্ন হইল দুঃখবন্ধ
উৎসবপতি মহানন্দ
তুমি সুন্দরতম।

লুকানো রহে না বিপুল মহিমা
বিঘ্ন হ'য়েছে চূর্ণ,
আপনি রচিলে আপনার সীমা,
আপনি করিলে পূর্ণ।
ভ'রেছে পূজার সাজি,
গান উঠিয়াছে বাজি',
নাগকেশরের গন্ধরেণুতে
উড়ে চন্দনচূর্ণ।
এ কী লীলা, হে বসন্ত,
ম্লান আবরণ আড়ালে দেখালে
সব দৈন্যের অন্ত।

অমানিত মাটি, দিবে তা'রে মান
এসেছো তাহারি জন্য ;

পথে পথে দিলে পরশের দান
ধূলিরে করিলে ধন্য।
যেথা আসো তুমি বীর
জাগে তব মন্দির,
বর্ণছটায় মাতে মহাকাশ
স্তব করে মহারণ্য!
এ কী লীলা, হে বসন্ত,
অনেক ভুলায়ে নিমেষে সহসা
দেখালে আপন পন্থ।

ছিনু পথ চেয়ে বহু দুখ স'য়ে,
আজ দেখি এ কী দৃশ্য,
শক্তি তোমার সুন্দর হ'য়ে
জিনিল কঠিন বিশ্ব।
তব পুষ্পিত তরু
জয় করি' নিল মরু,
মূক চিত্তের জাগাইলে গান,
কবি হ'লো তব শিষ্য।
এ কী লীলা, হে বসন্ত,
যা ছিল শ্রীহীন দীপ্তি-বিহীন
করিলে প্রজ্জ্বলন্ত!

আবাহন

গান

তোমার আসন পাত্‌বো কোথায়,
হে অতিথি ?
ছেয়ে গেছে শুক্‌নো পাতায়
কানন-বীথি।
ছিল ফুটে মালতী ফুল, কুন্দ কলি,
উত্তর বায় লুঠ্‌ ক'রে তায় গেল চলি',
হিমে বিবশ বনস্থলী
বিরল-গীতি,
হে অতিথি ॥
সুর-ভোলা ঐ ধরার বাঁশী
লুটায় ভুঁয়ে,
মর্ম্মে তাহার তোমার হাসি
দাও না ছুঁয়ে।
মাত্‌বে আকাশ নবীন রঙের তানে তানে,
পলাশ বকুল ব্যাকুল হবে আত্মদানে,
জাগ্‌বে বনের মুগ্ধ মনে
মধুর স্মৃতি,
হে অতিথি ॥

বসন্ত

হে বসন্ত, হে সুন্দর, ধরণীর ধ্যান-ভরা ধন !
বৎসরের শেষে
শুধু একবার মর্ত্ত্যে মূর্ত্তি ধরো ভুবন-মোহন
নব বরবেশে।
তারি লাগি' তপস্বিনী কী তপস্যা করে অনুক্ষণ,
আপনারে তপ্ত করে, ধৌত করে, ছাড়ে আভরণ,
ত্যাগের সর্ব্বস্ব দিয়ে ফল-অর্ঘ্য করে আহরণ
তোমার উদ্দেশে ॥

সূর্য্য প্রদক্ষিণ করি' ফিরে সে পূজার নৃত্য-তালে
ভক্ত উপাসিকা।
নম্র ভালে আঁকে তা'র প্রতিদিন উদয়াস্তকালে
রক্তরশ্মি-টীকা।
সমুদ্র-তরঙ্গে সদা মন্দ্রস্বরে মন্ত্র পাঠ করে,
উচ্চারে নামের শ্লোক অরণ্যের উচ্ছ্বাসে মর্ম্মরে,
বিচ্ছেদের মরুশূন্যে স্বপ্নচ্ছবি দিকে দিগন্তরে
রচে মরীচিকা ॥

আবর্ত্তিয়া ঋতুমাল্য করে জপ, করে আরাধন
দিন গুণে' গুণে'।
সার্থক হ'লো-যে তা'র বিরহের বিচিত্র সাধন
মধুর ফাল্গুনে।

হেরিনু উত্তরী তব, হে তরুণ, অরুণ আকাশে,
শুনিনু চরণধ্বনি দক্ষিণের বাতাসে বাতাসে,
মিলন-মাঙ্গল্য-হোম প্রজ্জ্বলিত পলাশে পলাশে,
রক্তিম আগুনে ॥

তাই আজি ধরিত্রীর যত কর্ম্ম, যত প্রয়োজন
হ'লো অবসান।
বৃক্ষ শাখা রিক্তভার, ফলে তা'র নিরাসক্ত মন,
ক্ষেতে নাই ধান।
বকুলে বকুলে শুধু মধুকর উঠিছে গুঞ্জরি'
অকারণ আন্দোলনে চঞ্চলিছে অশোক মঞ্জরী,
কিশলয়ে কিশলয়ে নৃত্য উঠে দিবস শর্ব্বরী,
বনে জাগে গান ॥

হে বসন্ত, হে সুন্দর, হায় হায়, তোমার করুণা
ক্ষণকাল তরে।
মিলাইবে এ উৎসব, এই হাসি, এই দেখাশুনা
শূন্য নীলাম্বরে।
নিকুঞ্জের বর্ণচ্ছটা একদিন বিচ্ছেদ-বেলায়
ভেসে যাবে বৎসরান্তে রক্ত-সন্ধ্যা-স্বপ্নের ভেলায়,
বনের মঞ্জীর-ধ্বনি অবসন্ন হবে নিরালায়
শ্রান্তি-ক্লান্তি-ভরে ॥

তোমারে করিবে বন্দী নিত্যকাল মৃত্তিকা-শৃঙ্খলে
শক্তি আছে কার?
ইচ্ছায় বন্ধন লও, সে বন্ধন ইন্দ্রজাল-বলে
করো অলঙ্কার।

সে বন্ধন দোলরজ্জু, স্বর্গে মর্ত্ত্যে দোলে ছন্দভরে,
সে বন্ধন শ্বেতপদ্ম, বাণীর মানস-সরোবরে,
সে বন্ধন বীণাতন্ত্র, সুরে সুরে সঙ্গীত-নির্ঝরে
বর্ষিছে ঝঙ্কার ॥

নন্দনে আনন্দ তুমি, এই মর্ত্ত্যে, হে মর্ত্ত্যের প্রিয়,
নিত্য নাই হ'লে ।
সুদূর মাধুর্য্যপানে তব স্পর্শ, অনির্ব্বচনীয়,
দ্বার যদি খোলে,
ক্ষণে ক্ষণে সেথা আসি' নিস্তব্ধ দাঁড়াবে বসুন্ধরা,
লাগিবে মন্দার-রেণু শিরে তা'র ঊর্দ্ধ হ'তে ঝরা,
মাটির বিচ্ছেদপাত্র স্বর্গের উচ্ছ্বাস-রসে ভরা
র'বে তা'র কোলে ॥

রাগরঙ্গ

গান

রঙ্ লাগালে বনে বনে,
ঢেউ জাগালে সমীরণে।
আজ ভুবনের দুয়ার খোলা,
দোল দিয়েছে বনের দোলা,
কোন্ ভোলা-সে ভাবে ভোলা
খেলায় প্রাঙ্গণে॥

আন্ বাঁশি তোর আন্ রে,
লাগ্‌লো সুরের বান রে,
বাতাসে আজ দে ছড়িয়ে
শেষ বেলাকার গান রে।
সন্ধ্যাকাশের বুক্‌ফাটা সুর
বিদায় রাতি ক'র্‌বে মধুর,
মাত্‌লো আজি অস্তসাগর
সুরের প্লাবনে॥

বসন্তের বিদায়

মুখখানি করো মলিন বিধুর
যাবার বেলা,
জানি আমি জানি সে তব মধুর
ছলের খেলা।
জানিগো, বন্ধু, ফিরে আসিবার পথে
গোপন চিহ্ন এঁকে যাবে তব রথে,
জানি তুমি তা'রে ভুলিবে না কোনোমতে,
যার সাথে তব হ'লো একদিন
মিলন-মেলা॥

জানি আমি যবে আঁখিজল ভরে
রসের স্নানে
মিলনের বীজ অঙ্কুর ধরে
নবীন প্রাণে।
খনে খনে এই চির-বিরহের ভাণ,
খনে খনে এই ভয়-রোমাঞ্চ দান,
তোমার প্রণয়ে সত্যসোহাগে
মিথ্যা হেলা॥

প্রার্থনা

গান

জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার জানি,
তবু মনে মনে প্রবোধ নাহি-যে মানি।
বিদায়-লগনে ধরিয়া দুয়ার
তবু-যে তোমায় বলি বারবার
"ফিরে এসো, এসো বন্ধু আমার"
বাষ্প-বিভল বাণী ॥

যাবার বেলায় কিছু মোরে দিয়ো দিয়ো
গানের সুরেতে তব আশ্বাস, প্রিয়।
বনপথে যবে যাবে, সে-ক্ষণের
হয়তো বা কিছু র'বে স্মরণের,
তুলি লবো সেই তব চরণের
দলিত কুসুমখানি ॥

অহৈতুক

গান

মন র'বে কি না র'বে আমারে
সে আমার মনে নাই গো।
ক্ষণে ক্ষণে আসি তব দুয়ারে
অকারণে গান গাই গো।
চ'লে যায় দিন, যতখন আছি
পথে যেতে যদি আসি কাছাকাছি
তোমার মুখের চকিত সুখের
হাসি দেখিতে-যে চাই গো,
তাই অকারণে গান গাই গো॥
ফাগুনের ফুল যায় ঝরিয়া
ফাগুনের অবসানে।
ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া
আর কিছু নাহি জানে।
ফুরাইবে দিন, আলো হবে ক্ষীণ,
গান সারা হবে, থেমে যাবে বীণ্,
যতখন থাকি ভ'রে দিবে না কি
এ খেলারি ভেলাটাই গো;
তাই অকারণে গান গাই গো॥

মনের মানুষ *

কত না দিনের দেখা
　　কত না রূপের মাঝে,
সে কার বিহনে একা
　　মন লাগে নাই কাজে।

কার নয়নের চাওয়া,
পালে দিয়েছিলো হাওয়া,
কার অধরের হাসি
　　আমার বীণায় বাজে॥

কত ফাগুনের দিনে,
চ'লেছিনু পথ চিনে,
কত শ্রাবণের রাতে
　　লাগে স্বপনের ছোঁওয়া।

---

* এই ছন্দ চৌপদী জাতীয় নহে। ইহার যতি-বিভাগ নিম্নলিখিত রূপে :—

কত না দিনের। দেখা
　　কত না রূপের। মাঝে।
সে কার বিহনে। একা
　　মন লাগে নাই। কাজে॥

চাওয়া-পাওয়া নিয়ে খেলা,
কেটেছিলো কত বেলা,
কখনো বা পাই পাশে
কখনো বা যায় খোওয়া ॥

শরতে এসেছে ভোরে
ফুল-সাজি হাতে ক'রে,
শীতে গোধূলির বেলা
জ্বালায়েছে দীপ-শিখা,

কখনো করুণ সুরে
গান গেয়ে গেছে দূরে,
যেন কাননের পথে
রাগিণীর মরীচিকা ॥

সেই সব হাসি কাঁদা,
বাঁধন খোলা ও বাঁধা,
অনেক দিনের মধু,
অনেক দিনের মায়া,

আজ এক হ'য়ে তা'রা,
মোরে করে মাতোয়ারা,
এক বীণা-রূপ ধরি'
এক গানে ফেলে ছায়া ॥

নানা ঠাঁই ছিল নানা
আজ তা'রে হ'লো জানা,
বাহিরে সে দেখা দিত
মনের মানুষ মম ;

আজ নাই আধাআধি,
ভিতর বাহির বাঁধি'
এক দোলাতেই দোলে
মোর অন্তরতম ॥

চঞ্চল

ওরে প্রজাপতি, মায়া দিয়ে কে যে
পরশ করিল তোরে !
অস্ত-রবির তুলিখানি চুরি ক'রে ।
বাতাসের বুকে যে-চঞ্চলের বাসা
বনে বনে তুই বহিস্ তাহারি ভাষা,
অপ্সরীদের দোল-খেলা ফুল-রেণু
পাঠায় কে তোর তু-খানি পাখায় ভ'রে ॥

যে-গুণী তাহার কীর্ত্তি-নাশার নেশায়
চিকন রেখার লিখন শূন্যে মেশায়,
সুর বাঁধে আর সুর যে হারায় ভুলে',
গান গেয়ে চলে ভোলা রাগিণীর কূলে,
তা'র হারা সুর নাচের হাওয়ার বেগে;
ডানাতে তোমার কখন্ প'ড়েছে ঝ'রে ॥

উৎসব

সন্ন্যাসী-যে জাগিল, ঐ জাগিল ঐ জাগিল।
হাস্যভরা দখিন বায়ে
অঙ্গ হ'তে দিল উড়ায়ে
শ্মশানচিতাভস্মরাশি ভাগিল কোথা ভাগিল।
মানসলোকে শুভ্র আলো
চূর্ণ হ'য়ে রং জাগালো,
মদির রাগ লাগিল তা'রে,
হৃদয়ে তা'র লাগিল।
আয়রে তোরা আয়রে তোরা আয়রে,
রঙের ধারা ঐ-যে ব'হে যায় রে॥
রঙের ঝড় উচ্ছ্বসিল গগনে,
রঙের ঢেউ রসের স্রোতে মাতিয়া ওঠে সঘনে;—
ডাকিল বান আজি সে কোন্ কোটালে।
নাকাড়া বাজে, কানাড়া বাজে বাঁশিতে
কান্নাধারা মিলিয়া গেছে হাসিতে,
প্রাণের মাঝে ফোয়ারা তা'র ছোটালে।
এসেছে হাওয়া বাণীতে দোল-দোলানো—
এসেছে পথ-ভোলানো,
এসেছে ডাক ঘরের দ্বার-খোলানো।
আয়রে তোরা আয়রে তোরা আয়রে
রঙের ধারা ঐ-যে ব'হে যায় রে।

উদয়-রবি যে রাঙা রঙ্ রাঙায়ে
পূর্ব্বাচলে দিয়েছে ঘুম ভাঙায়ে—
অস্তরবি সে রাঙা রসে রসিল,
চির-প্রাণের বিজয়বাণী ঘোষিল,
অরুণবীণা যে-সুর দিল রনিয়া
সন্ধ্যাকাশে সে-সুর উঠে ঘনিয়া,
নীরব নিশীথিনীর বুকে নিখিল ধ্বনি ধ্বনিয়া।
আয়রে তোরা আয়রে তোরা আয়রে
বাঁধনহারা রঙের ধারা ঐ-যে ব'হে যায় রে॥

শেষের রং

গান

রাঙিয়ে দিয়ে যাওগো এবার
যাবার আগে,—
আপন রাগে,
গোপন রাগে,
তরুণ হাসির অরুণ রাগে,
অশ্রুজলের করুণ রাগে ॥
রং যেন মোর মর্ম্মে লাগে
আমার সকল কর্ম্মে লাগে,
সন্ধ্যাদীপের আগায় লাগে,
গভীর রাতের জাগায় লাগে ॥
যাবার আগে যাওগো আমায়
জাগিয়ে দিয়ে,
রক্তে তোমার চরণ-দোলা
লাগিয়ে দিয়ে।
আঁধার নিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে,
পাষাণ-গুহার কক্ষে নিঝর-ধারা জাগে,
মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে,
বিশ্ব-নাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে,
তেমনি আমায় দোল দিয়ে যাও
যাবার পথে আগিয়ে দিয়ে,
কাঁদন-বাঁধন ভাগিয়ে দিয়ে ॥

দোল

আলোক-রসে মাতাল রাতে
বাজিল কার বেণু।
দোলের হাওয়া সহসা মাতে
ছড়ায় ফুল-রেণু।
অমল-রুচি মেঘের দলে
আনিল ডাকি' গগনতলে,
উদাস হ'য়ে ওরা-যে চলে
শূন্যে চরা ধেনু॥

দোলের নাচে সে বুঝি আছে
অমরাবতী পুরে?
বাজায় বেণু বুকের কাছে
বাজায় বেণু দূরে।
সরম ভয় সকলি ত্যেজে
মাধবী তাই আসিল সেজে,
শুধায় শুধু "বাজায় কে যে
মধুর মধু সুরে!"

গগনে শুনি এ কী এ কথা,
কাননে কী-যে দেখি!
একি মিলন-চঞ্চলতা?
বিরহ-ব্যথা একি?

আঁচল কাঁপে ধরার বুকে,
কী জানি তাহা সুখে না দুখে !
ধরিতে যারে না পারে তা'রে
স্বপনে দেখিছে কি ?

লাগিল দোল জলে স্থলে,
জাগিল দোল বনে,
সোহাগিনীর হৃদয়তলে
বিরহিণীর মনে।
মধুর মোরে বিধুর করে
সুদূর তা'র বেণুর স্বরে,
নিখিল হিয়া কিসের তরে
দুলিছে অকারণে ॥

আনো গো আনো ভরিয়া ডালি
করবীমালা ল'য়ে,
আনো গো আনো সাজায়ে থালি
কোমল কিশলয়ে।
এসো গো পীত বসনে সাজি',
কোলেতে বীণা উঠুক্ বাজি',
ধ্যানেতে আর গানেতে আজি
যামিনী যাক্ ব'য়ে ॥

এসো গো এসো দোল-বিলাসী
বাণীতে মোর দোলো।

ছন্দে মোর চকিতে আসি'
মাতিয়ে তা'রে তোলো।
অনেক দিন বুকের কাছে
রসের স্রোত থমকি' আছে,
নাচিবে আজি তোমার নাচে
সময় তারি হ'লো॥

কিশোর, আজি তোমার দ্বারে
পরাণ মম জাগে।
নবীন কবে করিবে তা'রে
রঙীন্ তব রাগে?
ভাবনাগুলি বাঁধন-খোলা
রচিয়া দিবে তোমার দোলা,
দাঁড়িয়ো আসি' হে ভাবে-ভোলা,
আমার আঁখি-আগে॥

বর্ষামঙ্গল

ও

বৃক্ষ-রোপণ

উৎসব

বর্ষা-মঙ্গল

গান

নীল অঞ্জনঘন-পুঞ্জছায়ায় সম্বৃত অম্বর,
হে গম্ভীর।
বনলক্ষ্মীর কম্পিত কায় চঞ্চল অন্তর,
ঝঙ্কৃত তা'র ঝিল্লির মঞ্জীর।
বর্ষণ-গীত হ'লো মুখরিত মেঘমন্দ্রিত ছন্দে,
কদম্ববন গভীর মগন আনন্দঘন গন্ধে,
নন্দিত তব উৎসব-মন্দির,
হে গম্ভীর।
দহন-শয়নে তপ্ত ধরণী প'ড়েছিলো পিপাসার্ত্তা,
পাঠালে তাহারে ইন্দ্রলোকের অমৃতবারির বার্ত্তা।
মাটির কঠিন বাধা হ'লো ক্ষীণ,
দিকে দিকে হ'লো দীর্ণ,
নব-অঙ্কুর জয়পতাকায় ধরাতল সমাকীর্ণ ;
ছিন্ন হ'য়েছে বন্ধন বন্দীর,
হে গম্ভীর॥

বৃক্ষ-রোপণ

গান

১

মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে,
হে প্রবল প্রাণ।
ধূলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে,
হে কোমল প্রাণ।
মৌনী মাটির মর্ম্মের গান কবে
উঠিবে ধ্বনিয়া মর্ম্মর তব রবে,
মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্লবে,
হে মোহন প্রাণ।

পথিকবন্ধু, ছায়ার আসন পাতি'
এসো শ্যাম সুন্দর,
এসো বাতাসের অধীর খেলার সাথী,
মাতাও নীলাম্বর।
উষায় জাগাও শাখায় গানের আশা,
সন্ধ্যায় আনো বিরাম-গভীর ভাষা,
রচি' দাও রাতে সুপ্তগীতের বাসা,
হে উদার প্রাণ।

গান

২

আয় আমাদের অঙ্গনে,
অতিথি বালক তরুদল,
মানবের স্নেহ-সঙ্গ নে,
চল্, আমাদের ঘরে চল্।
শ্যাম-বঙ্কিম ভঙ্গীতে
চঞ্চল কল-সঙ্গীতে
দ্বারে নিয়ে আয় শাখায় শাখায়
প্রাণ-আনন্দ কোলাহল॥
তোদের নবীন পল্লবে
নাচুক্ আলোক সবিতার,
দে পবনে বন-বল্লভে
মর্ম্মর গীত উপহার।
আজি শ্রাবণের বর্ষণে
আশীর্ব্বাদের স্পর্শ নে,
পড়ুক্ মাথায় পাতায় পাতায়
অমরাবতীর ধারাজল।

ক্ষিতি

বক্ষের ধন হে ধরণী, ধরো
ফিরে নিয়ে তব বক্ষে !
শুভদিনে এরে দীক্ষিত করো
আমাদের চির-সখ্যে।
অন্তরে পাক্ কঠিন শক্তি,
কোমলতা ফুলে পত্রে,
পক্ষিসমাজে পাঠাক্ পত্রী
তোমার অন্নসত্রে ॥

অপ

হে মেঘ, ইন্দ্রের ভেরী বাজাও গম্ভীর মন্দ্রস্বনে
মেদুর অম্বরতলে। আনন্দিত প্রাণের স্পন্দনে
জাগুক্ এ শিশুবৃক্ষ। মহোৎসবে লহো এ'রে ডেকে
বনের সৌভাগ্য-দিনে ধরণীর বর্ষা-অভিষেকে ॥

তেজ

সৃষ্টির প্রথম বাণী তুমি, হে আলোক ;
এ নব তরুতে তব শুভদৃষ্টি হোক্।
একদা প্রচুর পুষ্পে হবে সার্থকতা
উহার প্রচ্ছন্ন প্রাণে রাখো সেই কথা।
স্নিগ্ধ পল্লবের তলে তব তেজ ভরি'
হোক্ তব জয়ধ্বনি শতবর্ষ ধরি' ॥

মরুৎ

হে পবন করো নাই গৌণ,
আষাঢ়ে বেজেছে তব বংশী।
তাপিত নিকুঞ্জের মৌন
নিঃশ্বাসে দিলে তুমি ধ্বংসি'।
এ তরু খেলিবে তব সঙ্গে,
সঙ্গীতে দিয়ো এরে ভিক্ষা।
দিয়ো তব ছন্দের রঙ্গে
পল্লব-হিল্লোল শিক্ষা॥

ব্যোম

আকাশ, তোমার সহাস উদার দৃষ্টি
মাটির গভীরে জাগায় রূপের সৃষ্টি।
তব আহ্বানে এই তো শ্যামল মূর্তি
আলোক-অমৃতে খুঁজিছে প্রাণের পূর্তি।
দিয়েছো সাহস, তাই তব নীলবর্ণে
বর্ণ মিলায় আপন হরিৎপর্ণে।
তরু-তরুণেরে করুণায় করো ধন্য,
দেবতার স্নেহ পায় যেন এই বন্য॥

বৃক্ষ রোপণ

মাঙ্গলিক

প্রাণের পাথেয় তব পূর্ণ হোক্, হে শিশু চিরায়ু,
বিশ্বের প্রসাদস্পর্শে শক্তি দিক্ সুধা-সিক্ত বায়ু।
হে বালকবৃক্ষ, তব উজ্জ্বল কোমল কিশলয়
আলোক করিয়া পান ভাণ্ডারেতে করুক্ সঞ্চয়
প্রচ্ছন্ন প্রশান্ত তেজ। ল'য়ে তব কল্যাণকামনা
শ্রাবণ বর্ষণ-যজ্ঞে তোমারে করিনু অভ্যর্থনা।—
থাকো প্রতিবেশী হ'য়ে, আমাদের বন্ধু হ'য়ে থাকো।
মোদের প্রাঙ্গণে ফেলো ছায়া, পথের কঙ্কর ঢাকো
কুসুম বর্ষণে; আমাদের বৈতালিক বিহঙ্গমে
শাখায় আশ্রয় দিয়ো; বর্ষে বর্ষে পুষ্পিত উদ্যমে
অভিনন্দনের গন্ধ মিলাইয়ো বর্ষা-গীতিকায়,
সন্ধ্যা-বন্দনার গানে। মোদের নিকুঞ্জ-বীথিকায়
মঞ্জুল মর্ম্মরে তব ধরিত্রীর অন্তঃপুর হ'তে
প্রাণ-মাতৃকার মন্ত্র উচ্ছ্বসিবে সূর্য্যের আলোতে।
শত বর্ষ হবে গত, রেখে যাবো আমাদের প্রীতি
শ্যামল লাবণ্যে তব। সে-যুগের নূতন অতিথি
বসিবে তোমার ছায়ে। সেদিন বর্ষণ-মহোৎসবে
আমাদের নিমন্ত্রণ পাঠাইয়ো তোমার সৌরভে
দিকে দিকে বিশ্বজনে। আজি এই আনন্দের দিন
তোমার পল্লবপুঞ্জে পুষ্পে তব হোক্ মৃত্যুহীন!
রবীন্দ্রের কণ্ঠ হ'তে এ সঙ্গীত তোমার মঙ্গলে
মিলিল মেঘের মন্দ্রে, মিলিল কদম্ব-পরিমলে॥

বর্ষা-মঙ্গল

গান

৩

আহ্বান আসিল মহোৎসবে
অম্বরে গম্ভীর ভেরীরবে।
পূর্ব্ববায়ু চলে ডেকে
শ্যামলের অভিষেকে,
অরণ্যে অরণ্যে নৃত্য হবে।
নির্ঝর-কল্লোল-কলকলে
ধরণীর আনন্দ উচ্ছলে।
শ্রাবণের বীণাপাণি
মিলালো বর্ষণ-বাণী
কদম্বের পল্লবে পল্লবে।

৪

কোন্ পুরাতন প্রাণের টানে
ছুটেছে মন মাটির পানে।
চোখ ডুবে যায় নবীন ঘাসে
ভাবনা ভাসে পূব বাতাসে,
মল্লার গান প্লাবন জাগায়
মনের মধ্যে শ্রাবণ গানে।

লাগ্‌লো যে-দোল বনের মাঝে,
অঙ্গে সে মোর দেয় দোলা-যে।
যে-বাণী ঐ ধানের ক্ষেতে
আকুল হ'লো অঙ্কুরেতে,
আজ এই মেঘের শ্যামল মায়ায়
সেই বাণী মোর সুরে আনে।

৫

আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে
দুয়ার কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে,
ঘরের বাঁধন যায় বুঝি আজ টুটে'।
ধরিত্রী তাঁর অঙ্গনেতে
নাচের তালে ওঠেন মেতে,
চঞ্চল তা'র অঞ্চল যায় লুটে।
প্রথম যুগের বচন শুনি মনে
নব শ্যামল প্রাণের নিকেতনে।
পূব হাওয়া ধায় আকাশতলে
তা'র সাথে মোর ভাবনা চলে
কাল-হারা কোন্ কালের পানে ছুটে'।

৬

ঝড় নেবে আয়, আয়রে আমার শুক্‌নো পাতার ডালে
এই বরষায় নবশ্যামের আগমনের কালে।
যা' উদাসীন, যা' প্রাণহীন, যা' আনন্দহারা
চরম রাতের অশ্রুধারায় আজ হ'য়ে যাক্ সারা,
যাবার যাহা যাক্ সে চ'লে রুদ্রনাচের তালে।
আসন আমায় পাত্‌তে হবে রিক্ত প্রাণের ঘরে,
নবীন বসন প'র্‌তে হবে সিক্ত বুকের 'পরে।
নদীর জলে বান ডেকেছে কূল গেল তা'র ভেসে,
যূথীবনের গন্ধবাণী ছুট্‌লো নিরুদ্দেশে,
পরাণ আমার জাগ্‌লো বুঝি মরণ-অন্তরালে।

নবীন

নবীন

প্রথম পর্ব্ব

বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী,
দিক প্রান্তে, বন বনান্তে
শ্যাম প্রান্তরে আম্রছায়ে,
সরোবর তীরে নদী নীরে,
নীল আকাশে মলয় বাতাসে,
ব্যাপিল অনন্ত তব মাধুরী।
নগরে গ্রামে কাননে
দিনে নিশীথে
পিক সঙ্গীতে নৃত্য গীত-কলনে
বিশ্ব আনন্দিত ;
ভবনে ভবনে
বীণা তান রণ-রণ ঝঙ্কৃত।
মধু-মদ-মোদিত হৃদয়ে হৃদয়ে রে
নব প্রাণ উচ্ছ্বসিল আজি,
বিচলিত চিত উচ্ছলি' উন্মাদনা
ঝন ঝন ঝনিল মঞ্জীরে মঞ্জীরে॥

শুনেচো অলিমালা, ওরা ধিক্কার দিচ্চে ঐ ও-পাড়ার মল্লের দল ; তোমাদের চাপল্য তাদের ভালো লাগ্‌চে না। শৈবালগুচ্ছ-বিলম্বী ভারী ভারী সব কালো কালো পাথরগুলোর মতো তমিস্রগহন গাম্ভীর্য্যে ওরা গুহাদ্বারে-ভ্রূকুটি পুঞ্জিত ক'রে ব'সে আছে। কলহাস্যচঞ্চলা নির্ঝরিণী ওদের নিষেধ লঙ্ঘন

ক'রেই বেরিয়ে পড়ুক্‌ এই আনন্দময় বিশ্বের আনন্দপ্রবাহ দিকে দিগন্তে বইয়ে দিতে, নাচে গানে কল্লোলে হিল্লোলে; চূর্ণ চূর্ণ সূর্য্যের আলো উদ্বেল তরঙ্গভঙ্গের অঞ্জলি-বিক্ষেপে ছড়িয়ে ছড়িয়ে নিরুদ্দেশ হ'য়ে যেতে। এই আনন্দ-আবেগের অন্তরে অন্তরে যে-অক্ষয় শৌর্য্যের অনুপ্রেরণা আছে সেটা ও-পাড়ার শাস্ত্রবচনের বেড়া এড়িয়ে চলে গেল। ভয় ক'রোনা তোমরা, যে রস-রাজের নিমন্ত্রণে এসেচো তাঁর প্রসন্নতা যেমন আজ নেমেচে আমাদের নিকুঞ্জে ঐ অন্তঃস্মিত গন্ধরাজ মুকুলের প্রচ্ছন্ন গন্ধরেণুতে, তেমনি নামুক তোমাদের কণ্ঠে, তোমাদের দেহলতার নিরুদ্ধ নটনোৎসাহে। সেই যিনি সুরের গুরু, তাঁরই চরণে তোমাদের নৃত্যের নৈবেদ্য আজ নির্ঝরিত ক'রে দাও।

সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা
মোরা সুরের কাঙাল এই আমাদের ভিক্ষা!
মন্দাকিনীর ধারা,
উষার শুকতারা,
কনকচাঁপা কানে কানে যে-সুর পেলো শিক্ষা।
তোমার সুরে ভরিয়ে নিয়ে চিত্ত
যাবো যেথায় বেসুর বাজে নিত্য।
কোলাহলের বেগে
ঘূর্ণি উঠে জেগে,
নিয়ো তুমি আমার বীণার সেইখানেই পরীক্ষা॥

তুমি সুন্দর যৌবন-ঘন
রসময় তব মূর্ত্তি,
দৈন্যভরণ বৈভব তব
অপচয় পরিপূর্ত্তি।

নৃত্য গীত কাব্য ছন্দ
কল গুঞ্জন বর্ণ গন্ধ,
মরণহীন চির-নবীন
তব মহিমা স্ফূর্ত্তি ॥

ওদিকে আধুনিক আমলের বারোয়ারির দল ব'ল্‌চে উৎসবে নতুন কিছু চাই। কোণা-কাটা ত্যাড়াবাঁকা দুমদাম-করা কড়া-ফ্যাশানের আহেলা বেলাতি নতুনকে না হ'লে তাদের শুক্‌নো মেজাজে জোর পৌঁছচ্চে না। কিন্তু যাঁদের রস-বেদনা আছে তাঁরা কানে কানে ব'লে গেলেন আমরা নতুন চাইনে আমরা চাই নবীনকে। এঁরা বলেন মাধবী বছরে বছরে বাঁকা ক'রে খোঁচা মেরে সাজ বদ্‌লায় না, অশোক পলাশ একই পুরাতন রঙে নিঃসঙ্কোচে বারে বারে রঙীন। চিরপুরাতনী ধরণী চিরপুরাতন নবীনের দিকে তাকিয়ে ব'ল্‌চে, "লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল।" সেই নিত্যনন্দিত সহজ শোভন নবীনের উদ্দেশে তোমাদের আত্মনিবেদনের গান সুরু ক'রে দাও।

আন্‌ গো তোরা কা'র কী আছে,
দেবার হাওয়া বইলো দিকে দিগন্তরে
এই সুসময় ফুরায় পাছে।
কুঞ্জবনের অঞ্জলি-যে ছাপিয়ে পড়ে,
পলাশ-কানন ধৈর্য্য হারায় রঙের ঝড়ে,
বেণুর শাখা তালে মাতাল পাতার নাচে ॥
প্রজাপতি রঙ ভাসালো নীলাম্বরে,
মৌমাছিরা ধ্বনি উড়ায় বাতাস 'পরে।
দখিন হাওয়া হেঁকে বেড়ায় জাগো জাগো,
দোয়েল কোয়েল গানের বিরাম জানেনা গো,
রক্ত-রঙের জাগ্‌লো প্রলাপ অশোক গাছে ॥

আজ বরবর্ণিনী অশোক-মঞ্জরী তা'র চেলাঞ্চল আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে রক্ত-রঙের কিঙ্কিনী ঝঙ্কার বিকীর্ণ ক'রে দিলে; কুঞ্জবনের শিরীষ-বীথিকায় আজ সৌরভের অপরিমেয় দাক্ষিণ্য। ললিতিকা, আমরাও তো শূণ্য হাতে আসিনি। মাধুর্য্যের অতল সমুদ্রে আজ দানের জোয়ার লেগেচে, আমরাও ঘাটে ঘাটে দানের বোঝাই তরীর রসি খসিয়ে দিয়েচি। যে-নাচের তরঙ্গে তা'রা ভেসে প'ড়্‌লো, সেই নাচের ছন্দটা, কিশোর, দেখিয়ে দাও।

ফাগুন তোমার হাওয়ায় হাওয়ায়
ক'রেছি-যে দান
আমার আপনহারা প্রাণ,
আমার বাঁধন-ছেঁড়া প্রাণ ॥
তোমার অশোকে কিংশুকে
অলক্ষ্য রং লাগ্‌লো আমার অকারণের সুখে,
তোমার ঝাউএর দোলে
মর্ম্মরিয়া ওঠে আমার দুঃখরাতের গান ॥

পূর্ণিমা সন্ধ্যায়
তোমার রজনী-গন্ধায়
রূপ সাগরের পারের পানে উদাসী মন ধায়।
তোমার প্রজাপতির পাখা
আমার আকাশ-চাওয়া মুগ্ধচোখের রঙীন স্বপন মাখা;
তোমার চাঁদের আলোয়
মিলায় আমার দুঃখ সুখের সকল অবসান ॥

ভ'রে দাও, একেবারে ভ'রে দাও গো, "প্যালা ভর ভর লায়ী রে।" পূর্ণের উৎসবে দেওয়া আর পাওয়া, একেবারে একই কথা। ঝর্‌নার এক প্রান্তে কেবলি পাওয়া, অভ্রভেদী শিখরের দিক থেকে, আর এক প্রান্তে কেবলি দেওয়া অতলস্পর্শ সমুদ্রের দিক-পানে। এই ধারার মাঝখানে শেষে

বিচ্ছেদ নেই। অন্তহীন পাওয়া আর অন্তহীন দেওয়ার নিরবচ্ছিন্ন আবর্ত্তন এই বিশ্ব। আমাদের গানেও সেই আবৃত্তি, কেননা গান তো আমরা শুধু কেবল গাইনে, গান-যে আমরা দিই, তাই গান আমরা পাই।

গানের ডালি ভ'রে দে গো ঊষার কোলে—
আয় গো তোরা, আয় গো তোরা, আয় গো চ'লে।
চাঁপার কলি চাঁপার গাছে
সুরের আশায় চেয়ে আছে,
কান পেতেছে নতুন পাতা, গাইবি ব'লে।
কমল বরণ গগন মাঝে
কমল চরণ ঐ বিরাজে।
ঐখানে তোর সুর ভেসে যাক্,
নবীন প্রাণের ঐ দেশে যাক্,
ঐ যেখানে সোনার আলোর দুয়ার খোলে॥

মধুরিমা দেখো দেখো, চন্দ্রমা তিথির পর তিথি পেরিয়ে আজ তা'র উৎসবের তরণী পূর্ণিমার ঘাটে পৌঁছিয়ে দিয়েচে। নন্দনবন থেকে কোমল আলোর শুভ্র সুকুমার পারিজাত-স্তবকে তা'র ডালি ভ'রে আন্‌লো। সেই ডালিখানিকে ঐ কোলে নিয়ে ব'সে আছে কোন্ মাধুরীর মহাশ্বেতা। রাজ-হংসের ডানার মতো তা'র লঘু মেঘের শুভ্র বসনাঞ্চল স্রস্ত হ'য়ে প'ড়েচে ঐ আকাশে আর তা'র বীণার রূপোর তন্তুগুলিতে অলস অঙ্গুলি-ক্ষেপে থেকে থেকে গুঞ্জরিত হ'চ্চে বেহাগের তান।

নিবিড় অমা-তিমির হ'তে
বাহির হ'লো জোয়ার স্রোতে
শুক্লরাতে চাঁদের তরণী।

ভরিল ভরা অরূপ ফুলে,
সাজালো ডালা অমরা-কূলে
আলোর মালা চামেলি-বরণী।
শুক্লরাতে চাঁদের তরণী ॥

তিথির পরে তিথির ঘাটে
আসিছে তরী দোলের নাটে,
নীরবে হাসে স্বপনে ধরণী।
উৎসবের পসরা নিয়ে
পূর্ণিমার কূলেতে কি এ
ভিড়িল শেষে তন্দ্রাহরণী
শুক্লরাতে চাঁদের তরণী ॥

দোল লেগেচে এবার। পাওয়া আর না পাওয়ার মাঝখানে এই দোল। এক-প্রান্তে মিলন আর এক-প্রান্তে বিরহ, এই দুই প্রান্ত স্পর্শ ক'রে ক'রে দুল্চে, বিশ্বের হৃদয়। পরিপূর্ণ আর অপূর্ণের মাঝখানে এই দোলন। আলোতে ছায়াতে ঠেক্তে ঠেক্তে রূপ জাগ্চে জীবন থেকে মরণে, বাহির থেকে অন্তরে। এই ছন্দটি বাঁচিয়ে যে চ'ল্তে চায় সে তো যাওয়া-আসার দ্বার খোলা রেখে দেয়। কিন্তু ঐ যে হিসাবী মানুষটা দ্বারে শিকল দিয়ে আঁক পাড়্চে তা'র শিকল নাড়া দাও তোমরা। ঘরের লোককে অন্তত আজ এক দিনের মতো ঘর-ছাড়া করো।

ওরে গৃহবাসী, তোরা খোল্ দ্বার খোল্,
লাগ্লো-যে দোল্।
স্থলে জলে বন-তলে
লাগ্লো-যে দোল্।
খোল্ দ্বার খোল্ ॥

রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে,
রাঙা নেশা মেঘে মেশা প্রভাত আকাশে,
নবীন পাতায় লাগে রাঙা হিল্লোল।
খোল্ দ্বার খোল্॥

বেণুবন মর্ম্মরে দখিন বাতাসে,
প্রজাপতি দোলে ঘাসে ঘাসে—
মউমাছি ফিরে যাচি' ফুলের দখিণা,
পাখায় বাজায় তা'র ভিখারীর বীণা,
মাধবী-বিতানে বায়ু গন্ধে বিভোল।
খোল্ দ্বার খোল্॥

আমি সকল নিয়ে ব'সে আছি সর্ব্বনাশের আশায়,
আমি তা'র লাগি' পথ চেয়ে আছি পথে যে-জন ভাসায়।
যে-জন দেয় না দেখা যায় যে দেখে
ভালোবাসে আড়াল থেকে
আমার মন মজেছে সেই গভীরের
গোপন ভালোবাসায়।

সর্ব্বনাশের ব্রত যাদের, তাদের ভয় ভাঙিয়ে দাও। কারো কারো যে দ্বিধা ঘোচে না। ঐ দেখোনা পাতার আড়ালে মাধবী। ঐ অবগুণ্ঠিতাদের সাহস দাও। শুনচো না, বকুলগুলো ঝ'রতে ঝ'রতে ব'লচে, যা হয় তা হোক্ গে, আমের মুকুল ব'লে উঠ্‌চে, কিছু হাতে রাখ্‌বো না। যারা কৃপণতা ক'রবে তাদের সময় ব'য়ে যাবে।

হে মাধবী, দ্বিধা কেন, আসিবে কি ফিরিবে কি,
আঙিনাতে বাহিরিতে মন কেন গেল ঠেকি'।
বাতাসে লুকায়ে থেকে
কে-যে তোরে গেছে ডেকে,
পাতায় পাতায় তোরে পত্র সে-যে গেছে লেখি'।
কখন্ দখিন্ হ'তে কে দিল তুয়ার ঠেলি'
চমকি' উঠিল জাগি' চামেলি নয়ন মেলি'।
বকুল পেয়েছে ছাড়া,
করবী দিয়েছে সাড়া,
শিরীষ শিহরি' উঠে দূর হ'তে কারে দেখি'॥

তুমি কোন্ ভাঙনের পথে এলে, সুপ্তরাতে
আমার ভাঙ্‌লো যা তাই ধন্য হ'লো চরণপাতে।

নন্দিনী ঐ দেখে নাও, শিশুর লীলা, ঐ যে কচি কিশলয়

'শ্যামল কোমল চিকণ রূপের নবীন শোভা—দেখে যা—
কল উতরোল চঞ্চল-দোল ঐ যে বোবা।

শিশু হ'য়ে এসেচে চিরনবীন, কিশলয়ে তা'র ছেলেখেলা জমাবার জন্যে। দোসর হ'য়ে তা'র সঙ্গে যোগ দিল ঐ সূর্য্যের আলো, সেও সাজ্‌লো শিশু, সারাবেলা সে কেবল ঝিকিমিকি ক'র্‌চে। সেই তো তা'র কলপ্রলাপ। ওদের নাচে নাচে মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌লো প্রাণ-গীতিকার প্রথম ধুয়োটি।

ওরা অকারণে চঞ্চল।
ডালে ডালে দোলে, বায়ুহিল্লোলে
নব পল্লবদল।
ছড়ায়ে ছড়ায়ে ঝিকিমিকি আলো,
দিকে দিকে ওরা কী খেলা খেলালো ;
মর্ম্মর তানে প্রাণে ওরা আনে
কৈশোর কোলাহল।
ওরা কান পেতে শোনে গগনে গগনে
নীরবের কানাকানি,
নীলিমার কোন্ বাণী।
ওরা প্রাণ-ঝরণার উচ্ছ্বল ধার,
ঝরিয়া ঝরিয়া বহে অনিবার,
চির-তাপসিনী ধরণীর ওরা
শ্যামশিখা হোমানল॥

দীর্ঘ শূন্য পথটাকে এতদিন ঠেকেছিলো বড়ো কঠিন বড়ো নিষ্ঠুর। আজ তাকে প্রণাম। পথিককে সে তো অবশেষে এনে পৌঁছিয়ে দিলে। কিন্তু ভুল্‌বো কেমন ক'রে যে, যে-পথ কাছে নিয়ে আসে সেই পথই দূরে নিয়ে যায়—তাই মনে হয় ঘরের মধ্যে নিশ্চল হ'য়ে মিলন স্থায়ী হয় না, পথে বেরিয়ে প'ড়্লে তবেই পথিকের সঙ্গে বিচ্ছেদ এড়ানো যায়। তাই আজ পথকেই প্রণাম।

মোর পথিকেরে বুঝি এনেছো এবার
করুণ রঙীন পথ,
এসেছে এসেছে অঙ্গনে, মোর
দুয়ারে লেগেছে রথ।

সে-যে সাগর-পারের বাণী
মোর পরাণে দিয়েছে আনি',
তা'র আঁখির তারায় যেন গান গায়
অরণ্য পর্ব্বত ॥

দুঃখ-সুখের এপারে ওপারে
দোলায় আমার মন,
কেন অকারণ অশ্রু-সলিলে
ভ'রে যায় দু-নয়ন।
ওগো নিদারুণ পথ, জানি,
জানি পুন নিয়ে যাবে টানি'
তা'রে, চিরদিন মোর যে দিল ভরিয়া
যাবে সে স্বপনবৎ ॥

বাতাসের চলার পথে যে-মুকুল পড়ে ঝ'রে,
তা নিয়ে তোমার লাগি' রেখেছি ডালি ভ'রে।

টুক্‌রো টুক্‌রো সুখ-দুঃখের মালা গাঁথবো,—সাতনরী হার পরাবো তোমাকে মাধুর্য্যের মুক্তোগুলি চুনে নিয়ে। ফাগুনের ভরা সাজির উদ্বৃত্ত থেকে তুলে নেবো বনের মর্ম্মর, বাণীর সূত্রে গেঁথে বেঁধে দেবো তোমার মণিবন্ধে। হয়তো আবার আর-বসন্তেও সেই আমার দেওয়া ভূষণ প'রেই তুমি আসবে। আমি থাক্‌বো না, কিন্তু কী জানি আমার দানের ভূষণ হয়তো থাক্‌বে তোমার দক্ষিণ হাতে।

ফাগুনের নবীন আনন্দে
গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে।
দিল তা'রে বনবীথি
কোকিলের কলগীতি,
ভরি' দিল বকুলের গন্ধে॥

মাধবীর মধুময় মন্ত্র
রঙে রঙে রাঙালো দিগন্ত।
বাণী মম নিল তুলি'
পলাশের কলিগুলি,
বেঁধে দিল তব মণিবন্ধে॥

দ্বিতীয় পর্ব্ব

কেন ধ'রে রাখা ও-যে যাবে চ'লে
মিলন-লগন গত হ'লে।
স্বপন-শেষে নয়ন মেলো
নিবু নিবু দীপ নিবায়ে ফেলো,
কী হবে শুকানো ফুলদলে।

এখনো কোকিল ডাক্‌চে, এখনো শিরীষ বনের পুষ্পাঞ্জলি উঠ্‌চে ভ'রে ভ'রে, তবু এই চঞ্চলতার অন্তরে অন্তরে একটা বেদনা শিউরিয়ে উঠ্‌লো। বিদায়-দিনের প্রথম হাওয়া অশথ গাছের পাতায় পাতায় ঝর ঝর ক'রে উঠ্‌চে। সভার বীণা বুঝি নীরব হবে, দিগন্তে পথের একতারার স্থর বাঁধা হ'চ্চে—মনে হ'চ্চে যেন বসন্তী রঙ ম্লান হ'য়ে গেরুয়া রঙে নাম্‌লো।

চ'লে যায় মরি হায় বসন্তের দিন।
দূর শাখে পিক ডাকে বিরামবিহীন।
অধীর সমীর ভরে
উচ্ছ্বসি' বকুল ঝরে,
গন্ধ সনে হ'লো মন সুদূরে বিলীন।

পুলকিত আম্রবীথি ফাল্গুনেরি তাপে,
মধুকর গুঞ্জরণে ছায়াতল কাঁপে।
কেন জানি অকারণে
সারাবেলা আনমনে
পরাণে বাজায় বীণা কে গো উদাসীন॥

বিদায় দিয়ো মোরে প্রসন্ন আলোকে
রাতের কালো আঁধার যেন নামে না ঐ চোখে।

হে সুন্দর, যে-কবি তোমার অভিনন্দন ক'র্‌তে এসেছিলো তা'র ছুটি মঞ্জুর হ'লো। তা'র প্রণাম তুমি নাও। তা'র আপন গানের বন্ধনেই চিরদিন সে বাঁধা রইলো তোমার দ্বারে। তা'র সুরের রাখী তুমি গ্রহণ ক'রেচো আমি জানি; তা'র পরিচয় রইলো তোমার ফুলে ফুলে—তোমার পদ-পাত-কম্পিত শ্যামল শষ্পবীথিকায়।

বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক;
যায় যদি সে যাক্॥
রইলো তাহার বাণী রইলো ভরা সুরে,
রইবে না সে দূরে;

হৃদয় তাহার কুঞ্জে তোমার
রইবে না নির্ব্বাক ॥

ছন্দ তাহার রইবে বেঁচে
কিশলয়ের নবীন নাচে নেচে নেচে।
তা'রে তোমার বীণা যায় না যেন ভুলে,
তোমার ফুলে ফুলে
মধুকরের গুঞ্জরণে বেদনা তা'র থাক্ ॥

তবে শেষ ক'রে দাও শেষ গান
তার পরে যাই চ'লে।
তুমি ভুলো না গো এ রজনী
আজ রজনী ভোর হ'লে।

এর ভয় হ'য়েচে সব কথা বলা হ'লো না। এদিকে বসন্তের পালা সাঙ্গ হ'লো। ত্বরা কর্‌গো ত্বরা কর্—বাতাস তপ্ত হ'য়ে এলো, এই বেলা রিক্ত হবার আগে অঞ্জলি পূর্ণ ক'রে দে—তারপরে আছে করুণ ধূলি, তা'র আঁচল বিছিয়ে।

যখন মল্লিকা-বনে প্রথম ধ'রেছে কলি
তোমার লাগিয়া তখনি, বন্ধু,
বেঁধেছিনু অঞ্জলি ॥
তখনো কুহেলি-জালে
সখা তরুণী উষার ভালে
শিশিরে শিশিরে অরুণ মালিকা
উঠিতেছে ছলছলি' ॥

এখনো বনের গান
বন্ধু হয়নি তো অবসান,
তবু এখনি যাবে কি চলি'?
ও মোর করুণ বল্লিকা,
তোর শ্রান্ত মল্লিকা
ঝরো-ঝরো হ'লো, এই বেলা তোর
শেষ কথা দিস্ বলি'॥

"শুকনো পাতা কে যে ছড়ায় ঐ দূরে।" বসন্তের ভূমিকায় ঐ পাতাগুলি একদিন আগমনীর গানে তাল দিয়েছিলো, আজ তা'রা যাবার পথের ধূলিকে ঢেকে দিল, পায়ে পায়ে প্রণাম ক'র্‌তে লাগলো বিদায়-পথের পথিককে। নবীনকে সন্ন্যাসীর বেশ পরিয়ে দিয়ে ব'ল্‌লে, "তোমার উদয় সুন্দর; তোমার অস্তও সুন্দর।"

ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে।
অনেক হাসি অনেক অশ্রুজলে
ফাগুন দিল বিদায়-মন্ত্র
আমার হিয়াতলে॥
ঝরা পাতা গো, বসন্তী রং দিয়ে
শেষের বেশে সেজেছো তুমি কি এ!
খেলিলে হোলি ধূলায় ঘাসে ঘাসে
বসন্তের এই চরম ইতিহাসে।
তোমারি মতো আমারো উত্তরী
আগুন রঙে দিয়ো রঙীন করি',
অস্ত-রবি লাগাক্ পরশমণি
প্রাণের মম শেষের সম্বলে॥

সে-যে কাছে এসে চ'লে গেল তবু জাগিনি—
কী ঘুম তোরে পেয়েছিলো হতভাগিনী—

মন ছিল সুপ্ত কিন্তু দ্বার ছিল খোলা, সেইখান দিয়ে কার নিঃশব্দ চরণের আনাগোনা। জেগে উঠে দেখি ভুঁই-চাঁপা ফুলের ছিন্ন পাপড়ি লুটিয়ে আছে তা'র যাওয়ার পথে। আর দেখি ললাটে পরিয়ে দিয়ে গেছে বরণমালা, তা'র শেষ দান, কিন্তু এ-যে বিরহের মালা।

কখন্ দিলে পরায়ে
স্বপনে বরণ মালা, ব্যথার মালা।
প্রভাতে দেখি জেগে
অরুণ মেঘে
বিদায় বাঁশরী বাজে অশ্রু-গালা॥
গোপনে এসে গেলে
দেখি নাই আঁখি মেলে।
আঁধারে দুঃখ-ডোরে
বাঁধিল মোরে,
ভূষণ পরালে বিরহ-বেদন-ঢালা॥

হে বনস্পতি শাল, অবসানের অবসাদকে তুমি দূর ক'রে দিলে। তোমার অক্লান্ত মঞ্জরীর মধ্যে উৎসবের শেষ-বেলাকার ঐশ্বর্য্য, নবীনের শেষ জয়ধ্বনি তোমার বীরকণ্ঠে। অরণ্যভূমির শেষ আনন্দিত বাণী তুমি শুনিয়ে দিলে যাবার পথের পথিককে, ব'ল্লে, পুনর্দ্দর্শনায়। তোমার আনন্দের সাহস বিচ্ছেদের সাম্‌নে এসে মাথা তুলে দাঁড়ালো।

ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল
মাধবী ঝরিল ভূমিতলে অবসন্ন।

সৌরভ-ধনে তখন তুমি হে শাল
বসন্তে করো ধন্য।
সান্ত্বনা মাগি' দাঁড়ায় কুঞ্জভূমি
রিক্তবেলায় অঞ্চল যবে শূন্য।
বন-সভাতলে সবার ঊর্দ্ধে তুমি,
সব অবসানে তোমার দানের পুণ্য॥

এইবার শেষ দেওয়া-নেওয়া চুকিয়ে দাও। দিয়ে যাও তোমার বাহিরের দান, উত্তরীয়ের সুগন্ধ, বাঁশির গান, আর নিয়ে যাও আমার অন্তরের বেদনা, নীরবতার ডালি থেকে—

তুমি কিছু দিয়ে যাও
মোর প্রাণে গোপনে গো।
ফুলের গন্ধে, বাঁশির গানে,
মর্ম্মর-মুখরিত পবনে।
তুমি কিছু নিয়ে যাও
বেদনা হ'তে বেদনে।
যে মোর অশ্রু হাসিতে লীন
যে-বাণী নীরব নয়নে॥

দূরের বাণীকে জাগিয়ে দিয়ে গেল পথিক। এমনি ক'রেই বারে বারে সে কাছের বন্ধন আল্‌গা ক'রে দেয়। একটা অপরিচিত ঠিকানার উদ্দেশ ব'লে দিয়ে যায় কানে কানে—সাহসের সুর এসে পৌঁছয় বিচ্ছেদ-সমুদ্রের পরপার থেকে—মন উদাস হ'য়ে যায়।

বাজে করুণ সুরে, (হায় দূরে,)
তব চরণ-তল-চুম্বিত পন্থবীণা।
এ মম পান্থ-চিত চঞ্চল
জানি না কী উদ্দেশে ॥

যূথী-গন্ধ অশান্ত সমীরে
ধায় উতলা উচ্ছ্বাসে,
তেমনি চিত্ত উদাসী রে
নিদারুণ বিচ্ছেদের নিশীথে ॥

IMPERIAL LIBRARY